আহার ও ধর্ম্ম

কালিকানন্দ স্বামী

আহার ও ধর্ম্ম

হিমালয়বাসী পরমহংস পরিব্রাজকার্য্য
শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী

প্রণীত

প্রকাশক—
কালিকানন্দ বেদান্ত আশ্রম,
বি, ১৭।৫৫নং তিলভাণ্ডেশ্বর রোড,
বারাণসী, ইউ, পি

১৯৬০ ইং সাল

[মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান :—

১। প্রকাশকের নিকট—

বি ১৭।৫৫, তিলভাণ্ডেশ্বর রোড, বারাণসী, ইউ, পি।

২। মহেশ লাইব্রেরী,

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা—১২

৩। কালিকানন্দ বেদান্ত আশ্রম (শাখা)—

১২১, নিউ টালিগঞ্জ, পোঃ পূর্ব্ব পুটীয়ারী,

ভায়া—কলিকাতা-৩৩

[দ্বিতীয় (পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত) সংস্করণ]

মুদ্রণে—এ, রায়
সিটি প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৭, বসন্ত বোস রোড,
কলিকাতা-২৬।

ভূমিকা।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া আজ পর্য্যন্ত সকলেই লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছেন, ভারতবর্ষে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগতের মধ্যে বিখ্যাত ধর্ম্মগুরু বুদ্ধদেবের নাস্তিক আখ্যা; কর্ম্মকাণ্ড খণ্ডন করিয়া জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করিতে যাইয়া শঙ্করাচার্য্যের অকাল মৃত্যু; সতীদাহ নিবারণ করিতে যাইয়া রাজা রামমোহন রায়ের লাঞ্ছনা; মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন করিতে যাইয়া স্বামী দয়ানন্দের নির্য্যাতন প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তই রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে অনেক সুসভ্য জাতি যাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন সেই যীশুখৃষ্ট ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন; মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদকেও প্রাণভয়ে মদিনায় পলায়ন করিতে হইয়াছিল, ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু তথাপি সত্যোপলব্ধিকারী ব্যক্তিগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সত্যের প্রচার করিতে কিছুতেই ভীত বা বিরত হন না। কারণ সত্য যে বস্তু তাহা সাম্প্রদায়িক অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তিবিশেষের বুঝিতে অসুবিধা হইলেও বিবেকী ও বিচারশীল ব্যক্তিগণের নিকট যুক্তি ও তর্কে উহা অকাট্য হইয়া চিরকালই সত্য থাকিবে। সেই সাহসে নির্ভর করিয়াই এই গ্রন্থ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতের হিন্দুগণের মধ্যে আহার ও ধর্ম্ম লইয়া ঘোরতর সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা দূর করিয়া সর্ব্বসাধারণ যাহাতে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আহার্য্য গ্রহণে দেহ ও মনের উৎকর্ষ লাভ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে সহজে উন্নতি লাভ করিতে পারে, মাত্র সেই উদ্দেশ্যেই সত্যের প্রচারের জন্য এই পুস্তক প্রকাশ। এই গ্রন্থে সত্য অবগত হইয়া স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের উন্নতি করা ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

গ্রন্থাদি যন্ত্রের সাহায্যে মনোমন্থন করিয়া যে সত্যামৃতের উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত করিলাম। তেজোবীর্য্য-হীন, ক্ষুদ্রচিত্ত, বিবেক-বিচারহীন, ভীরু এবং সংস্কার ও বিশ্বাস ব্যাধিতে বধির ব্যক্তিগণের কর্ণে এই গ্রন্থের মর্ম্ম প্রবেশ করিবে না। যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ী কুসংস্কারান্ধ "কাটা" বা "রক্ত" শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলে যাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, হীনতা, দীনতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, এই গ্রন্থ তাহাদের প্রীতিকর হইবে না। অনেক ব্যক্তি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া মোহের ঘোরে অনেক প্রকার কটু-কাটব্যাদি প্রয়োগ করিবেন, কেহবা জাগিয়াও ঘুমের ভাণ করিয়া স্বার্থহানি ভয়ে নির্ব্বাক্ থাকিবেন। যদিও গ্রন্থের মর্ম্ম সত্য হউক, তথাপি অজ্ঞানের অন্ধকূপের মধ্যে এই সত্যের আলো কিছুতেই প্রবেশ করিবে না। একমাত্র সত্যপ্রিয়, বিবেক ও বিচারশীল ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া ইহা কার্য্যকরী হইবে।

ইহাতে অদ্ভূত ভূতের গল্প বা ২১ হাত লম্বা মানুষ ও লক্ষ বর্ষ পরমায়ু ইত্যাদি অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়, অপ্রমাণ্য ঠাকুরমা, দিদিমার গল্প নাই। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতে উন্নতির জন্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক খাদ্য এবং দেহ ও মনের 'আহার ও ধর্ম্ম' বিষয়ে বেদ-বেদান্তাদি নানাশাস্ত্র, যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা, যাহাতে সত্যের প্রচার হইয়া কুধারণা সমাজ হইতে তিরোহিত হয়, এই গ্রন্থের তাহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। মিথ্যা প্রচারের ফলে আমরা ভারতবাসী সর্ব্বপ্রকারেই অধঃপাতে গিয়াছি। তাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে দেশের ও দশের পরস্পরে হিংসা বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি এবং একতার সৃষ্টি হইয়া দেশ শান্তিপূর্ণ হইবে। ইতি—

গ্রন্থকার।

—সূচী পত্র—

বিষয় পত্রাঙ্ক

স্বামী কালিকানন্দ পরমহংস মহারাজ

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

আহার ও ধর্ম্ম।

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং অবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারং আশ্রয়েঽভীষ্টসিদ্ধয়ে ॥

আহার দ্বারা ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক নির্ণয় করা ভ্রম।

অনেকেই ধর্ম্মালোচনা করিবার বা ধর্ম্ম কথা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হন। এই ধর্ম্মকথা ধার্ম্মিকের মুখেই শুনিতে হয়। যিনি ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। তাই শাস্ত্রও বলেন যে, পাণ্ডিত্যাভিমানী বা ভণ্ডের নিকট ধর্ম্মকথা না শুনিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী লোকের মুখেই ধর্ম্মকথা শুনা বা তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করা সঙ্গত। এই ধার্ম্মিক নির্ব্বাচন করিতে গিয়া অজ্ঞানগণ প্রকৃত ধার্ম্মিকের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, কে কি আহার

করেন, কেবলমাত্র তাহা দেখিয়াই 'ধার্ম্মিক', 'অধার্ম্মিক' স্থির করিয়া থাকে। সেইজন্যই প্রধানতঃ আহারতত্ত্ব বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়া আহারের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেই ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক বা জ্ঞানী ও অজ্ঞান নির্ব্বাচন করা যাইবে। মানবের দেহ ২টী—'স্থূল' ও 'সূক্ষ্ম'; তাই তাহাদের আহারও দ্বিবিধ। হাড়-রক্ত-মাংসে তৈয়ারী এই দেহকে 'স্থূল দেহ' বলে এবং তদতিরিক্ত 'মন' বলিয়া একটী সূক্ষ্ম বস্তু আছে, তাহাকে 'সূক্ষ্ম দেহ' বলা হয়। ভাত, ডাল, তরকারী রুটি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং মৎস্য-মাংসাদি স্থূল-দ্রব্য সকল ঐ স্থূল দেহের আহার। ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যাদির মধ্যে যে সূক্ষ্ম স্বাদ অর্থাৎ তিক্ত, লবন, অম্ল ও মধুর ইত্যাদি স্বাদ আছে তাহা ঐ সূক্ষ্ম মনের আহার বলিয়া গণ্য। সাধারণ মানবগণ এই দুই প্রকারের তত্ত্ব জানে না বলিয়াই কেবল এক স্থূল খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া সমাজে কলহের সৃষ্টি করে।

এই পৃথিবীতে আমিষ ও নিরামিষ দুই প্রকার খাদ্যই প্রচলিত ছিল ও আছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে এই আহারতত্ত্ব লইয়া ভারতের হিন্দু-সমাজে জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক এমন একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহাতে দিন দিন সমাজের ও ধর্ম্মের অধঃপতন হইয়া দেশ রসাতলে যাইতেছে। তর্কস্থলে অনেকেই বলিয়া থাকে যে, 'নিরামিষ আহারই সকলের পক্ষে সাত্ত্বিকাহার'। নিরামিষাহারিগণ আমিষাহারীকে ঘৃণার চক্ষে দেখে অথচ আমিষাহারীগণ কিন্তু নিরামিষাহারীকে ঘৃণা না করিয়া বরং শ্রদ্ধাই করিয়া থাকে। আমিষাহারিগণ নিরামিষাহারকে সাত্ত্বিকাহার বলে কিন্তু নিরামিষাহারিগণ আমিষ আহার দ্বারা সত্ত্বগুণের পরিচয় পাইয়াও উহাকে সাত্ত্বিকাহার বলিতে স্বীকৃত হয় না। পশু-পক্ষী হইতে আরম্ভ করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, আমিষভোজী অপেক্ষা নিরামিষভোজিগণ প্রধানতঃ দুর্ব্বল, ভীরু, ক্রোধী, কামাতুর এবং হিংসা-দ্বেষসম্পন্ন হইয়া থাকে। এখন ভাবিয়া দেখ যে, ঐ সকল লক্ষণই

কি সত্ত্বগুণের পরিচায়ক? অজ্ঞগণ একমাত্র বাহ্যিক বেশভূষা ও আহার দ্বারাই লোককে ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, পাপী, পুণ্যবান, জ্ঞানী, অজ্ঞান ইত্যাদি দোষ গুণে আরোপিত করিয়া থাকে। বিদ্বান, বিজ্ঞানী অথবা বুদ্ধিমান ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরাই মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ এবং গণ্যমান্য বলিয়া পরিচিত হন। এইরূপ গুণের আদর হওয়াই জগতের স্বাভাবিক রীতি ও সর্ব্ববাদী-সম্মত। আমরা ভারতের হিন্দুগণ ঐ সকল গুণের বিচার করিতে অক্ষম হইয়া, কেবল দেখি যে, কোন্ ব্যক্তি কাহার স্পৃশ্য এবং কি বস্তু আহার করে। অজ্ঞ হিন্দুগণ মাত্র ঐ আহার দ্বারাই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব এবং মনের স্তর নির্ণয় করিয়া সমাজের ও দেশের বহু রকমে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে।

যদি কোন ব্যক্তি কিছুই না খাইয়া উপবাস করিয়া দিন কাটায় তবে সে সমাজে সিদ্ধ, মুক্তপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়; আর যে ব্যক্তি ফল, মূল, শাক, সব্জী খাইয়া থাকে সমাজে তাহাকে সাধক বলিয়া থাকে; এবং আতপন্ন ও ডাল, তরকারী, দুগ্ধাদি দ্বারা নিরামিষ আহার করিলে সেও নৈষ্ঠিক বলিয়া সমাজে কিছু সম্মান পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি মৎস্য মাংসাদি দ্বারা আমিষ ভোজন করে, সে বিজ্ঞ, আত্মজ্ঞানী হইলেও অনেকেই তাঁহাকে নরাধম মহাপাপী মনে করে। এই হইল বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি!

ধর্ম্ম বিষয়ের সার মর্ম্ম অবগত হইতে না পারায়, নির্দ্দিষ্ট পথানুসরণ করিতে না পারিয়া কেবল বাহ্যিক ধর্ম্মের ধ্বজা ফোঁটা, তিলকাদি দেখাইয়া, লোক সমাজে 'আমি ধার্ম্মিক' বলিয়া প্রকাশ করিতে যাহারা সতত চেষ্টিত, সেই সকল অজ্ঞ লোকেরাই কেবল আমিষ ভোজন হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া প্রকাশ করে। অথচ শাস্ত্রাদি যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এতৎসম্বন্ধে কোন কিছু না পাইয়াও কেবল তাহাদের নিজ নিজ যুক্তিহীন ভ্রান্তমত প্রচার করিয়া সামাজিক শারীরিক ও মানসিক এবং পারমার্থিক ধর্ম্মের উন্নতির পথে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটাইয়াছে ও ঘটাইতেছে। ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষ

ভাবে আমাদের শারীরিক অধঃপতন হইয়া সর্ব্বপ্রকারেই আমরা রসাতলে যাইতেছি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটীর বিশেষ ঘনিষ্টতা থাকায় যখন কোন জাতির ধর্ম্মের অধঃপতন হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর তিনটীরও অধঃপতন হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ভারতেরও ঐ চারিটীরই অধঃপতন হইতে চলিয়াছে। প্রোক্ত ধর্ম্মধ্বজিগণ বলে যে, 'আমিষ আহারে তমঃ ও রজোগুণ বৃদ্ধি হয়, অতএব সাধন-ভজনের জন্য নিরামিষ আহার করা সকলেরই প্রয়োজন'। আবার কেহ বলে যে, 'মৎস্য, মাংস মানুষের অখাদ্য বস্তু' ইত্যাদি। কাজেই এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তি প্রমাণাদি সহ নিরপেক্ষভাবে বিচার দ্বারা যাহাতে কুসংস্কার দূর হইয়া পুনরায় সেই পুরাকালের মুণিঋষিদের খাদ্য সাত্ত্বিক আহার দেশে প্রচলিত হইয়া দেশের ও দশের সর্ব্বপ্রকার শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করা ভারতবাসী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের সেই পূর্ব্ব গৌরবের দিনে আমিষভোজন দেহ ও মনের উন্নতিলাভ করাইয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সহায়তাই করিত এবং বর্ত্তমানেও করিতেছে। তাই মুণিঋষিগণ নিজেরা নানাপ্রকার আমিষ ভোজন করিয়া পরবর্ত্তিগণকেও ঐরূপে ভোজন করার জন্য শাস্ত্রে বিধি দিয়া গিয়াছেন। তথাপি কুসংস্কারান্ধ ধর্ম্মধ্বজিগণ তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে। তর্কস্থলে অনেকেই কতকগুলি বাগাড়ম্বর করিয়া থাকে যে, 'আমরা আর্য্যজাতি ও সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এবং বেদ-বেদান্তাদি আমাদের শাস্ত্র ; অতএব জগতে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ' ইত্যাদি। যদি তোমরা সেই মাংসভোজী ঋষিদের বংশধরই হও অর্থাৎ যদি সেই ঋষিদের রক্তপ্রবাহ তোমাদের শরীরে থাকে, তবে আমিষভোজীকে স্পর্শ করিলেই এখন তোমাদের শরীর অশুচি হয় কি প্রকারে? বেদ-বেদান্তের কথা উল্লেখ করিয়া তৎকালীন খাদ্যাখাদ্য ও আচার ব্যবহার দেখাইলে অনেক সংস্কারান্ধ বিচারহীন ব্যক্তি অঙ্গুলী দিয়া শ্রবন বন্ধ করিবে। হয়ত কেহ বলিবে যে 'এই সকল ম্লেচ্ছের

আহার'। অথচ অপর দিকে '‘বেদ স্বয়ং ব্রহ্মার বাণী' ইহা সর্ব্বদাই নির্ব্বিচারে প্রামাণ্য বলিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে। এই সকল বেদোল্লিখিত খাদ্যাদি খাইয়াই সেকালের মুণিঋষিগণ সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই লিখিত গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া আজ আমরা যাহা কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেছি। অতএব কোন ব্যক্তি বেদ, তন্ত্র ও পুরাণোক্ত খাদ্য আহার করিলে তাহাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কি কারণ থাকিতে পারে? বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া গিয়া ভারতের হিন্দুগণ এখন কেবল সাম্প্রদায়িক দম্ভ ও অভিমানে স্ফীত হইয়া চলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি মুষ্টিমেয় লোকই মিথ্যা ধর্ম্মসংস্কারের বশে অসার শাক-পাতা, লাউ-বেগুনাদি নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে। তবে কি সমগ্র পৃথিবীতে এই অল্প কয়টী সংস্কারান্ধ অজ্ঞ লোকই মাত্র ধার্ম্মিক? আর, অন্য অসংখ্য মৎস্য মাংস ভোজিগণ মহাপাপী, অধার্ম্মিক? সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ইহার সত্য তত্ত্ব নির্ণয় করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

আহার্য্য বিষয়ে শাস্ত্র-যুক্তি ও প্রমাণ।

অনেকে বলেন যে, শাস্ত্রে নিরামিষ আহারেরই বিধি আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—

আয়ুঃ-সত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ-স্নিগ্ধা-স্থিরা-হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারারাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

অর্থাৎ—"আয়ু-বৃদ্ধিকর, সত্ত্ববৃদ্ধিকর, বলকারক, আরোগ্যসম্পাদক, সুখকর, প্রীতিবর্দ্ধনকর, সরস (রসযুক্ত) স্নিগ্ধ এবং স্থায়ী ও মনোহর আহারসকল স্বাত্ত্বিকগণের প্রিয়। অতিকটু (অতিরিক্ত নিম্বাদি তিক্ত) অতি অম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (অতিরিক্ত লঙ্কা মরিচাদি), অতি রুক্ষ অতি বিদাহী (অতিরিক্ত সর্ষপাদি) দ্রব্য ভোজনকালে দুঃখদায়ক এবং উদরস্থ হইলে চিত্তের অবসন্নতা সম্পাদক ও অনন্তর রোগজনক। এই সকল আহার রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্ত (অর্থাৎ এক প্রহরেরও অধিককাল পূর্ব্বে প্রস্তুত করা জিনিষ) নীরস, দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত (পূর্ব্ব দিনের পাক করা, বাসী) উচ্ছিষ্ট (অন্যের ভোজনাবশিষ্ট) কদর্য্য যে ভোজন-সামগ্রী, তাহা তামসগণের প্রিয়।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যভেদে গুণের পার্থক্য করা হয় নাই, গুণের পার্থক্যেই খাদ্যের পার্থক্য (রুচির প্রভেদ) করিয়াছেন।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপ গুণবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তির সেইরূপ খাদ্য প্রিয় হইবে। এই এই দ্রব্যে সত্ত্বগুণ, এই এই দ্রব্যে রজোগুণ ও এই এই দ্রব্যে তমোগুণ আছে, অতএব ইহা আহার করিলে তদ্দ্বারা সেই সেই দ্রব্যগুণ শরীরে প্রকাশ পায়, এইরূপ কোন কথা অথবা সাত্ত্বিক ব্যক্তির আমিষ বা নিরামিষ আহার করা সঙ্গত বা প্রিয় হইবে, এতৎ সম্বন্ধে কোন কথাই গীতা নির্দ্ধারণ করেন নাই। বরং শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুসারে দেখা যায় যে, যে সকল গুণবিশিষ্ট আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয় বলিয়া গণ্য, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দ্রব্যগুণ দৃষ্টে ছাগ, মেষ, মহিষ, ঘোড়া, এবং শূকর, দুম্বা, কচ্ছপ, মোরগ প্রভৃতি পশু-পক্ষীর মাংসেই সেই সকল গুণ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। সুস্বাদ, বিস্বাদ, সুগন্ধ, দুর্গন্ধযুক্ত যে খাদ্যা-খাদ্যের ব্যবহার, তাহা নানা প্রদেশে বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রকমই দেখা যায়। কারণ সমাজস্থাপকগণ দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রকম খাদ্যেরই প্রচলন করিয়াছেন। বংশ-ক্রমাগত যে আহারের অভ্যাস হয়, ক্রমে তাহাই সংস্কারে পরিণত হয়। শিশুকাল হইতেই প্রত্যেকের নিজ নিজ সমাজোচিত খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস হয় বলিয়াই সেই খাদ্য তাহার নিকট বিস্বাদ বা দুর্গন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। যেমন পেঁয়াজ, রসুনাদি দ্বারা তৈয়ারী কোন তরকারী আহার করিয়া মুসলমানদিগের মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইবে, কিন্তু কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের নিকট ঐ তরকারী দিলে পেঁয়াজ, রসুন আহারে তিনি অনভ্যস্ত বলিয়াই তাহার নিকট উহা দুর্গন্ধযুক্ত ও ঘৃণিত বলিয়া বোধ হইবে। ব্রহ্মদেশে 'নাপ্‌পি' নামক তাহাদের অতি উপাদেয় এক প্রকার খাদ্য আছে, উহা অনেক দিন পূর্ব্বের পঁচা মৎস্য দ্বারা তৈয়ারী অতি দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য কিন্তু তথাপি সেই খাদ্যই তাহাদের দেশে সুস্বাদু ও উপাদেয় বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অথচ ভারতবর্ষের ঘৃতপক্ক অন্নাদি ব্রহ্মদেশীয় নিকট তৃপ্তিপ্রদ হয় না। কাজেই এক সমাজে যাহা তৃপ্তিকর আহার, অন্য সমাজে তাহা ঘৃণার্হ, ইহাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া

যায়। সুতরাং একই আহার সকলের পক্ষে সাত্ত্বিক বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইতে পারে না। শুষ্ক মৎস্য, পেঁয়াজ, রসুন ও পনিরাদি যে সকল দ্রব্যকে আমরা পঁচা, দুর্গন্ধ ও ঘৃণিত বলিয়া মনে করি, ইংলণ্ড প্রভৃতি অনেক সুসভ্য ও উন্নত সমৃদ্ধ দেশবাসীরা সেই সকল দ্রব্য আহার করিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া স্বাস্থ্যবান ও মেধাশীল হইতেছে। 'সত্যযুগে মুনিঋষিগণ কেবল ফলমূল ভক্ষণ করিয়াই নির্জ্জন বনে থাকিয়া সাধন-ভজন করিতেন' এইরূপ মুখরোচক ও শ্রুতিমধুর গল্প বংশপরম্পরায় অনেকেই ঠাকুরমা ও দিদিমার মুখে শুনিয়া আসিতেছেন কিন্তু এখন উহার সত্যানুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, কি পাওয়া যায়। এই ভারতবর্ষে সেই প্রাচীন আর্য্য মুনিঋষিগণ আহারের জন্য অসংখ্য পশু-পক্ষী ও মৎস্যাদি জীব হত্যা করিতেন। মনুসংহিতা বলিয়া গিয়াছেন—

যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণৈর্ব্বধ্যাঃ প্রশস্তা মৃগপক্ষিণঃ
ভৃত্যানাঞ্চৈব বৃত্ত্যর্থ মগস্ত্যো হ্যাচরৎ পুরা ॥
বভূবুর্হি পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং মৃগপক্ষিণাম্।
পুরাণেষ্বপি যজ্ঞেষু ব্রহ্ম-ক্ষত্র-সবেষু চ ॥

অর্থাৎ—"ভোজন যজ্ঞের জন্য অথবা অবশ্য পোষ্যগণের ভরণ-পোষণের জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রশস্ত পশু-পক্ষী বধ করিতে পারেন। পুরাকালে অগস্ত্য মুনি এইরূপ বহু পশু-পক্ষী শিকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভোজন যজ্ঞে ভক্ষ্য পশু-পক্ষীর মাংসের দ্বারা 'পুরোডাশ' (এক প্রকার মাংসের পিষ্টক, বর্ত্তমানকালের চপের মত) প্রস্তুত হইত।" বশিষ্ঠ সংহিতায় আছে—

হ্যগস্ত্যোবর্ষসাহস্রিকে সত্রে মৃগয়াং চকার।
তস্যা সংস্তু রসময়া পুরোডাশা মৃগপক্ষিণাম্ প্রশস্তানামপি হ্যন্নম্।

অর্থাৎ—(মহর্ষি অগস্ত্যমুনি শিকার কার্য্যে সুনিপুণ ছিলেন) "সেই অগস্ত্য ঋষি সহস্র বর্ষ পরিমিত কাল ভোজন যজ্ঞে বহু শিকার করিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রবিহিত অসংখ্য পশু-পক্ষীর রসময় মাংসে ঐ যজ্ঞের পুরোডাশ

(পিষ্টক বিশেষ) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।" মনুসংহিতা বলিয়াছেন—

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্॥

অর্থাৎ—"জগতিতলে যে কিছু পদার্থ আছে সে সমুদয়ই প্রজাপতি জীবের অন্নস্বরূপে (খাদ্য রূপে) সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব স্থাবর অন্ন শাক, ফল প্রভৃতি এবং জঙ্গম পশু-পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি সমস্তই প্রাণীর ভোজ্য।"

মহা-বামন পুরাণে বর্ণিত আছে—

শশকঃ শল্যকো গোধা সমেধা মৎস্যকচ্ছপৌ
তদ্বদ্বিদলকাদীনি ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ॥

অর্থাৎ—"শশক (খরগোস), শল্যক (সজারু), গোসাপ (গুইল), সমেধ, মৎস্য, কচ্ছপ ও দ্বিরেফ পশু (গো ও অজা হইতে জাত পশু বিশেষ) দ্বিজের ভোজ্য ইহা মনু বলিয়াছেন।" অঙ্গিরা, হারীত, বিষ্ণু, কাত্যায়ন, অত্রি, ব্যাস, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, যম এবং বশিষ্ঠ আদি বহু স্মৃতিকারগণ আমিষ আহারের জন্য জলচল, স্থলচর ও ব্যোমচর ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন -

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধা-গোধা-কচ্ছপ-সল্লকাঃ
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি হি সিংহতুণ্ডক-রোহিতাঃ।
তথা পাঠীন-রাজীব-সশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ॥

অর্থাৎ—'সেধা, গোসাপ (গুইল), কচ্ছপ, সজারু (সেজা), শশক প্রভৃতি পশু এবং সিং, তুণ্ডক (বোয়াল মৎস্য) রোহিত, পুঁটি, মাগুর এবং যাবতীয় সশল্ক (আশ যুক্ত) মৎস্য দ্বিজাতীর ভক্ষ্য।" ব্যাস সংহিতায় ব্যাস বলিয়াছেন—

নাশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণো মাংস মনিযুক্তঃ কথঞ্চন।
ক্রতৌ শ্রাদ্ধে নিযুক্তো বা অনশ্নন্ পততি দ্বিজঃ॥

অর্থাৎ—"কোন যজ্ঞে ব্রতী না হইয়া ব্রাহ্মণ কোন মাংস ভক্ষণ করিবেন না। আবার যজ্ঞে বা শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভক্ষণ না করিলে দ্বিজ পতিত হন।" মনুসংহিতায় আছে—

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥

অর্থাৎ—"যে মনুষ্য যজ্ঞাদি দেব-কার্য্যে যথাশাস্ত্র নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে, সে মৃত হইয়া ক্রমে একবিংশতি জন্ম পর্য্যন্ত পশু-যোনি প্রাপ্ত হয়।" মনুর এই কঠোর শাসনবাক্য দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দেব-কার্য্যে যে প্রকারেই হউক মাংসের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। স্বয়ং মহাদেব মহানির্ব্বানতন্ত্রে দেবী ভগবতীকে বলিয়াছেন—

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।
তৎসর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ—"হে দেবী! মাংস ত্রিবিধ,—জলচর, ভূচর এবং খেচর। এই মাংস যে কোনও স্থান হইতে আনীত হউক, এবং যে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক পশু, পক্ষী বা মৎস্যাদি ঘাতিত হউক তৎ সমুদায়ই দেবতার প্রীতির নিমিত্ত হইবে অর্থাৎ দেবতাদের ভোগে দিলে তাহাতে দেবতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।"

এইরূপ বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতি শাস্ত্রাদেশমতে নিত্য-নৈমিত্তিক আহারের এবং ভোজন যজ্ঞের জন্য যে পূর্ব্ব আর্য্য মুণিঋষিগণ অসংখ্য পশু-পক্ষী ও মৎস্যাদি হত্যা করিতেন, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ অসংখ্য প্রমাণ রহিয়াছে। ঐ সকল শাস্ত্রাদিতে আমিষ এবং নিরামিষ

উভয় প্রকার আহারেরই ব্যবস্থা আছে কিন্তু নির্দ্দিষ্টভাবে কোনটাকে সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। কারণ দুর্ব্বল বলীর ভক্ষ্য। সর্ব্বদাই বড় জীব ক্ষুদ্র জীবকে, বড় কীট ক্ষুদ্র কীটকে আহার করিতেছে এবং ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চিন্নানন্নং ভবতি ইতি

ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি নানন্নং পরিগৃহীতং ইতি।

কিমন্নং কিং মে বাস ইতি যদিদং কিঞ্চাশ্বভ্য আকৃমিভ্য

আকীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেহন্নম্ ॥

অর্থাৎ—(কোন এক সময়ে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ, 'আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই শ্রেষ্ঠ' এইরূপ প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারের জন্য পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে বিচারার্থ প্রজাপতির নিকট গমন করিয়াছিল। সেই বিচারে প্রাণই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। তখন সেই প্রাণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ও প্রজাপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে)—"তোমরা যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিলে, এখন আমার অন্ন (ভক্ষণীয়) কি হইবে এবং বস্ত্র আচ্ছাদনই বা কি হইবে তাহা নির্দ্দেশ কর।" তদুত্তরে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে. এই জগতে কুক্কুর হইতে আরম্ভ করিয়া. কৃমি হইতে ধরিয়া, কীট, পতঙ্গ হইতে গণনা করিয়া জীবগণের যাহা খাদ্য এবং কৃমি, কীট, পতঙ্গের যাহা ভক্ষ্য ও অন্যান্য প্রাণিগণের যাহা কিছু ভক্ষণীয় আছে, সেই সমুদয়ই তোমার অন্ন এবং জল তোমার বস্ত্রস্বরূপ হইবে।" সুতরাং এস্থলেও দেখা যায় যে স্বয়ং প্রজাপতিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুকেই খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন। মনুসংহিতা বলিয়াছেন—

চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিনা মপ্যদংষ্ট্রিণঃ।

অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ ॥

অর্থাৎ—"অচর জড়বস্তু যথা তৃণাদি স্থাবর, চরণশীল মনুষ্য, পশু পক্ষ্যাদি জঙ্গমের ভক্ষ্য; দন্তহীন প্রাণী দন্তশীল প্রাণীর ভক্ষ্য; দন্তহীন মৎস্যাদি

হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যাদির ভক্ষ্য এবং ভীরু জীবেরা চিরকালই বীরগণের অন্ন (খাদ্য)।” মনুসংহিতা আরও বলিয়াছেন,—

নাত্মা দুষ্যত্যদন্নত্থান্ প্রাণিনোঽহন্যহন্যপি।
ধাত্রৈব সৃষ্ট্যা হ্যাদ্যাশ্চ প্রাণিনোঽত্তার এবচ॥

অর্থাৎ—“কোন প্রকার হিংসা বা ক্রোধাদি বৃত্তি না আনিয়া কেবল আহার বুদ্ধিতে ভক্ষ্য জীবকে প্রত্যহ ভোজন করিলে, ভোক্তার কোনও পাপ হয় না; যেহেতু একই বিধাতা কোন কোন জীবকে ভক্ষ্য ও কোন কোন জীবকে ভোক্তারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।”

যে কোনও প্রকারে উত্তম মাংস সংগ্রহ করিয়া দেবকার্য্যে এবং পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনে দেওয়ার বিধিও শাস্ত্রে বহুস্থানেই রহিয়াছে। মনুসংহিতা বলিয়াছেন—

ক্রীত্বা স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃত মেব বা
দেবান্ পিতৃং শ্চার্চ্চয়িত্বা খাদন্মাংসং ন দুষ্যতি॥

অর্থাৎ—“পশু মাংস ক্রয় করিয়া, ভিক্ষা বা শিকারাদি দ্বারা উহা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া, অথবা পরের নিকট হইতে উহা দানপ্রাপ্ত হইয়া দেবতা ও পিতৃগণকে তদ্দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভোজন করিলে তাহাতে দোষভাগী হইতে হয় না।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোনও প্রকারে মাংস পাইলেই ঐরূপ পিতৃ-কার্য্য ও দেব-কার্য্য করিবে। কোন কোন সংহিতাদি পাঠ করিলে দেখা যায় যে, আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার আহার সম্বন্ধেই বিধি ও নিষেধ দুই মতই আছে। আমিষাহারিগণ ঐ সকল শাস্ত্র বাক্য ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজ মত সমর্থন করেন; পক্ষান্তরে নিরামিষ-আহারিগণ তাহার বিরুদ্ধ বাক্য গ্রহণ করিয়া তর্ক উপস্থিত করেন। নিজ মতের সঙ্গে অনৈক্য হওয়ায় কেহবা শাস্ত্র-বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া হেলা করেন। কাজেই ঐগুলি নিষেধবাক্য কি প্রক্ষিপ্ত বাক্য, তাহা শাস্ত্রালোচনা ক্রমে নির্দ্ধারণ করা দরকার।

নিজ বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত আসিলে অথবা মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধে,

মধুপর্কে এবং যজ্ঞে পশুবধ করিয়া মাংস প্রদান করিতেই হইবে এবং মাংস ভিন্ন যে মধুপর্ক তৈয়ার হইতেই পারে না, তৎসম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রেও বহুস্থলে উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ মাংস না দিয়া মাত্র দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, দধি ও মধু ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়াই নিরামিষ মধুপর্ক তৈয়ার করিয়া থাকেন। কেহ কেহ দধি বা চিনির পরিবর্ত্তে জল দিয়া থাকেন অথচ মনুস্মৃতি প্রভৃতিতেও মধুপর্কে মাংস দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। অথর্ব্ব বেদে আছে—

স এষ এবং বিদ্বান্মাংসমুপসিচ্যোপহরতি ॥

অর্থাৎ—"বিদ্বান অতিথিকে মাংস দ্বারা ভোজন করাইবে।"

মহারাজ দশরথের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠমুণি যিনি অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে আত্মতত্ত্বোপদেশ দিয়া জ্ঞানলাভ করাইয়াছিলেন, অর্থাৎ 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' গ্রন্থ যাঁহার মুখের বাণী, তিনি মহামুণি বাল্মীকির আশ্রমে অতিথি হইয়া গোমাংস দ্বারা পরিতোষরূপে ভোজন করিলে পর উক্ত আশ্রমস্থিত বাল্মীকিমুণির শিষ্য সৌধাতকি ও ভাণ্ডায়ন সমপাঠি দুইজনে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিল—

সৌধাতকি—"তেন পরাপতিতে নৈব সা বরাকিকা
কল্যাণিকা মড়মড়ায়িতা।"

অর্থাৎ—সৌধাতকি বলিল, "হে ভাণ্ডায়ন! বশিষ্ঠমুণি আসিয়াই সেই হতভাগা বৎসতরীর অস্থি মাংস মড়্ মড়্ শব্দে চর্ব্বণ করিয়া ফেলিলেন।"

উত্তর রামচরিত বলেন,—

ভাণ্ডায়ন—"সমাংসো মধুপর্ক ইত্যায়ন্নায়ং বহুমন্যমানাঃ
শ্রোত্রিয়ায়াভ্যাগতায় বৎসতরীং মহেক্ষাংবা নির্ব্বপন্তি
গৃহমেধিনঃ তং হি ধর্ম্মসূত্রকারাঃ সমাম্নন্তি।"

অর্থাৎ—তদুত্তরে ভাণ্ডায়ন বলিল, "হে সৌধাতকি! 'মাংসের দ্বারা মধুপর্ক প্রস্তুত করিয়া অতিথি ও অভ্যাগতদিগকে দান করা কর্ত্তব্য এই বেদ-বাক্যের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করিয়া গৃহস্থগণ অতিথিরূপে সমাগত

বেদাধ্যায়ী বিপ্র বা রাজন্যের অভ্যর্থনার জন্য বৎসতরী, বৃষ অথবা বৃহৎ ছাগলের মাংস প্রদান করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ইহাই প্রধান ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।” মনুসংহিতা বলিতেছেন,—

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥

অর্থাৎ—“গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলেই মধুপর্কের জন্য, জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের জন্য এবং মাতৃ-পিতৃ ও দৈব-কার্য্যের জন্যই পশুহিংসা করিবে। অন্য কোন উপলক্ষে পশু বিনাশ করিতে নাই। স্বয়ং মনু ইহা বলিয়াছেন”

সপ্তগ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্তারণ্যা ইতি গবাদয়োঽপক্ষিণ
শ্চতুষ্পাজ্জাতিবচন পশুশব্দঃ মধুপর্ক ব্যাখ্যাতঃ,
তত্র গোবধোবিহিতঃ॥ * * * ইত্যাতিথ্যেষ্টিঃ ব্রাহ্মণঃ
গোবধো মধুপর্কবিধাবুক্তো গোঘ্নোঽতিথিরিতি।
যতোঽস্তি মধুপর্কে দধিদানং মাংসভোজনাদিদানঞ্চ।
(মনুসংহিতা-ভাষ্যে মেধাতিথি)

অর্থাৎ—“সাতটী গ্রাম্য পশু ও সাতটী বন্য পশু, পক্ষ রহিত চতুষ্পদ জাতি বাচক গরু প্রভৃতিই মধুপর্কোক্ত পশু শব্দের অর্থ। মধুপর্কে গোবধ বিহিত। এইজন্যই অতিথিকে গোঘ্ন বলা হয়। কারণ মধুপর্কে অতিথিকে দধি ও মাংস দানের ব্যবস্থা আছে।”

ইহার ভাবার্থ এই যে—সেই পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে কাহারও গৃহে কোন অতিথি অভ্যাগত আগমন করিলেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নানা-প্রকার পশু-পক্ষীর মাংস এবং দধি ইত্যাদি উত্তম খাদ্য দ্বারা প্রচুর মধুপর্ক প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা সেই অতিথিকে এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যোপলক্ষেও ঐরূপ মধুপর্ক দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করান হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ ঐরূপ অধিকাংশ স্থলে নিরামিষ ভোজনেরই ব্যবস্থা করেন এবং কোন পূজা বা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে মাংস না দিয়াই খাঁটি

নিরামিষভাবে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, চিনি ও মধু ইত্যাদি দ্বারা অতি ক্ষুদ্র পাত্রে অৰ্দ্ধ তোলা পরিমিত যে মধুপর্ক প্রস্তুত করা হয় তাহাও খাদ্যরূপে গ্রহণ না করিয়া ফেলিয়া দেয়।

সেই পুরাকালে মানুষ মরিয়া গিয়াও মাংসের লোভ সংবরণ করিয়া থাকিতে পারিত না। কারণ মনুস্মৃতি ও বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থের নিম্নোক্ত শ্লোকের মর্ম্মানুযায়ী মৃত পিতা-মাতাদিগকে স্বর্গে তৃপ্ত রাখার জন্য শ্রাদ্ধে যে সকল মাংসের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মনুস্মৃতিতে লিখিত আছে—

তিলৈর্ব্রীহিযবৈর্ম্মাষৈরদ্ভির্মূলফলেন বা।
দত্তেন মাংসৈ প্রীয়ন্তে বিধিবৎ পিতরো নৃণাং
দ্বৌ মাসৌ মৎস্যমাংসেন ত্রীন্মাসান্ হরিণেন তু
ঔরভ্রেণাথ চতুরঃ শাকুনেনাথ পঞ্চ বৈ।
ষণ্মাসান্ ছাগমাংসেন রৌরবেণ নবৈবতু
দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।
শশকূর্ম্ময়োঃ মাংসেন মাসানেকাদশৈব তু
সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ।
বাধ্রীণসস্য মাংসেন তৃপ্তির্দ্বাদশবার্ষিকী
কালশাকং মহাশল্কাঃ খড়গলোহামিষং মধু।
অনন্ত্যায়ৈব কল্পন্তে মুন্যন্নানিচ সর্ব্বশঃ।

অর্থাৎ—"তিল, ব্রীহি, যব, মাষকলাই, ফল-মূল এবং নানাবিধ মাংসের দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হয়েন। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে মৎস্য এবং মাংসের দ্বারা ভোজন করাইলে পিতৃগণ দুইমাস কাল স্বর্গে তৃপ্ত থাকেন। ব্রাহ্মণদিগকে হরিণ মাংসের দ্বারা ভোজন করাইলে তিনমাস ঔরভ (ভেড়া) মাংসে চারিমাস, পক্ষীর মাংসে পাঁচমাস, ছাগ মাংসে ছয়মাস, রুরুমৃগমাংসে নয়মাস এবং মেষ, মহিষ ও বরাহ মাংসে দশমাস কাল তৃপ্ত থাকেন। শশক ও কচ্ছপের মাংসে এগারমাস এবং তৎসঙ্গে

গব্যঘৃত, দুগ্ধ এবং পায়স প্রদান করিলে বার মাস কাল তৃপ্ত থাকেন। বাধ্রীনস পক্ষীর মাংসে বার বৎসর কাল তৃপ্ত থাকেন। কালশাক, মহাশল্ক (মোচা চিংরী মৎস্য), খড়্গ (গণ্ডার), লোহামিষ (লাল লোমযুক্ত ছাগ মাংস) ও মধু এই সকল বস্তু দ্বারা অনন্তকালের জন্য স্বর্গে তৃপ্ত থাকেন।" বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

হবিষ্যমৎস্যমাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
শৌকরচ্ছাগলৈরেণৈ রৌরবৈর্গবয়েন চ॥
ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধাঃ পিতামহাঃ।
প্রযান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রীণসামিষৈঃ॥
খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু।
শস্তানি কর্ম্মণ্যত্যন্ততৃপ্তিদানি নরেশ্বর॥

অর্থাৎ—"ঔর্ব্ব কহিলেন,—শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য অর্থাৎ নিরামিষ ভোজন করাইলে পিতৃগণ এক মাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। মৎস্য দ্বারা ভোজন করাইলে দুই মাস, শশক মাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারি মাস, শূকর মাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগ মাংস প্রদান ছয় মাস, এণমৃগ-মাংস প্রদানে সাত মাস, রুরুমৃগ-মাংস দিলে আট মাস ও গবয় মাংস (গলকম্বলশূন্য গোতুল্য পশু বিশেষ, বন গোরু) প্রদানে নয় মাস এবং মেষ-মাংস প্রদানে দশ মাস, গোমাংস প্রদানে এগার মাস পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্তু যদি বাধ্রীণস পক্ষীর মাংস দেওয়া যায় তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন। হে রাজন্! গণ্ডারের মাংস, কালশাক ও মধু এই সমুদয় দ্রব্য শ্রাদ্ধ কর্ম্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক।" হরিবংশীয় সপ্তব্যাধোপাখ্যানে একস্থানে লিখিত আছে যে—

তে নিয়োগাদ্ গুরোস্তস্য গাং দোগ্ধ্রীং সমকালয়ন্।
ক্রূরবুদ্ধিঃ সমভবত্তাং মাং বৈ হিংসিতুং তদা॥

পিতৃভ্যঃ কল্পয়িত্বৈনামুপাযুঞ্জত ভারত।
স্মৃতিপ্রত্যবমর্ষশ্চ তেষাং জাত্যন্তরেঽভবৎ॥
অত্র গুরো র্গাং হত্বা শ্রাদ্ধেন চৌরাণাম্।

অর্থাৎ—"তাহারা গুরুর আজ্ঞায় সেই দুগ্ধবতী গাভীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় তাহাদিগের হৃদয়ে সেই গাভীকে মারিবার নিমিত্ত ক্রুরবুদ্ধি উৎপন্ন হইল। হে ভারত! তাহারা ঐ গোমাংসের দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়া উহা ভোজন করিল। জন্মান্তরে তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি আর লোপ হইল না।" এই উপাখ্যানে গুরুর গাভী চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা অপহরণপূর্ব্বক উহাকে মারিয়া সেই মাংসের দ্বারা যে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিল তাহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু সে-সকল উদ্ধৃত করিয়া অনর্থক গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। অতএব আজকাল যে-সকল পণ্ডিতমহাশয় বলেন, 'মৎস্য-মাংস অপবিত্র জিনিষ, উহা মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধে না দিয়া, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদিগকে বিশুদ্ধ নিরামিষ ভোজন করানই শাস্ত্রসম্মত' ইত্যাদি, সেই সকল 'পাতি' (ব্যবস্থা) দাতা পণ্ডিতগণ বোধ হয় শাস্ত্র, যুক্তি ও প্রমাণের দিকে কোনই লক্ষ্য না করিয়া কেবল তাহাদের নিজ নিজ ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্ব্বল পাকস্থলীর দিকে চাহিয়াই শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিজেদের রুচি অনুযায়ী ঐরূপ নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অতএব এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, আমিষ খাদ্য যদি অখাদ্য কিংবা অপবিত্র অশ্রদ্ধার জিনিষই হইবে, তবে তাহা দেব-কার্য্যে এবং মাতৃ-পিতৃ শ্রাদ্ধে ও অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়ার বিধি কিছুতেই থাকিত না।

স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রানুযায়ী আহার্য্যের গুণাগুণ দেখিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করাই সর্ব্ববাদী সম্মত। সেই আয়ুর্ব্বেদেও দেখা যায় যে, মাংসের মত পুষ্টিকর, বলাধান, বীর্য্যবর্দ্ধক ও স্থৈর্য্যকর অন্য কোন খাদ্যই জগতে নাই। সেই আয়ুর্ব্বেদেই উক্ত আছে—

শরীরবৃংহণে নান্যদাদ্যং মাংসাদ্বিশিষ্যতে॥ (চরকসংহিতা)

অর্থাৎ—"শরীর-পোষকের মধ্যে মাংসাপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ খাদ্যই এই জগতে নাই।"

মাংসো বৃংহণীয়ানাং। কুক্কুটো বল্যানাং। নক্ররেতো বৃষ্যাণাং। (চরকসংহিতা)

অর্থাৎ—"তেজঃপ্রার্থীর পক্ষে মাংসাহার প্রয়োজন। বলার্থীর পক্ষে কুক্কুট (মোরগ) এবং স্থূলতা প্রার্থীর পক্ষে নক্ররেত (কুম্ভীর বা হাঙ্গর) আহার করাই বিহিত এবং ইহাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।"

চরকসংহিতায় বর্ণিত কতিপয় পশু-পক্ষীর মাংসের গুণাগুণও নিম্নে দেখান যাইতেছে,—

স্নিগ্ধাশ্চোষ্ণাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ স্বরবোধনাঃ।
বল্যাঃ পরং বাতহরাঃ স্বেদনাশ্চরণায়ুধাঃ॥

অর্থাৎ—"মোরগের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বৃষ্য (বীর্য্য বর্দ্ধক), বৃংহণ (বর্দ্ধন-শক্তিবিশিষ্ট), স্বরশুদ্ধিকারী, বলকারক, অত্যন্ত বায়ুনাশক ও স্বেদজনক।" (সকল জাতীর শরীর একই পঞ্চভূতের উপাদানে তৈয়ারী হইয়াছে। সুতরাং চরকসংহিতায় বর্ণিত খাদ্যের গুণাগুণ সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য—কেবল মুসলমানদের জন্যই নয়।)

কষায়মধুরাঃ শীতা রক্তপিত্তনিবর্হণাঃ।
বিপাকে মধুরাশ্চৈব কপোতা গৃহবাসিনঃ॥

অর্থাৎ—"গৃহবাসী কপোতের (কবুতরের) মাংস কষায়, মধুর, শীতল, রক্ত-পিত্ত নাশক এবং উহা বিপাক মধুর।"

গব্যং কেবলবাতেষু পীনসে বিষমজ্বরে।
শুষ্ককাসশ্রমাত্যগ্নিমাংসক্ষয়হিতঞ্চ যৎ ॥

অর্থাৎ—"গোমাংস কেবল, বায়ু রোগে, পীনস রোগে, বিষমজ্বরে, শুষ্ক কাসে, পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে, অতিশয় অগ্নিতে এবং দেহের মাংসক্ষয়ে বিশেষ হিতকর।" (কেবল মুসলমানের জন্যই নয়।)

বল্যো বাতহরো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো বলবর্দ্ধন।
মেধাস্মৃতিকরঃ পথ্যঃ শোষঘ্নঃ কূর্ম্ম উচ্যতে।

অর্থাৎ—'কচ্ছপ মাংস বলপ্রদ, বাত নাশক, বৃষ্য (বীর্য্য বর্দ্ধক), নেত্র-তেজ ও বল বর্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকর, পথ্য ও যক্ষ্মা বিনাশক।"

গোধা বিপাকে মধুরা কষায়কটুকা স্মৃতা
বাতপিত্তপ্রশমনী বৃংহণী বলবর্দ্ধনী।

অর্থাৎ—"গোধার (গুইলের) মাংস মধুরবিপাক, কটু-কষায় রস, বাত-পিত্ত প্রশমক, বৃংহণ (বর্দ্ধন-শক্তিবিশিষ্ট) ও বলবর্দ্ধক।"

ধার্ত্তরাষ্ট্রচকোরাণাং দক্ষাণাং শিখিনামপি।
চটকানাঞ্চ সানি স্যুরণ্ডানি চ হিতানি চ ॥

অর্থাৎ—"ধার্ত্তরাষ্ট্র (গেঁড়ি হাঁস), চকোর, দক্ষ (মোরগ), ময়ুর এবং চড়াই পক্ষীর ডিম্ব শরীরের পক্ষে যথেষ্ট হিতকর।"

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাভিজ্ঞ মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্যও আহার্য্য মধ্যে মাংসেরই শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া পশু-পক্ষীর মাংসের গুণাগুণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

অশ্বাশ্বতর-গোখরোষ্ট্র-বস্তোরভ্রমেদঃপুচ্ছকপ্রভৃতয়ো গ্রাম্যাঃ।
(সুশ্রুতসংহিতা)

অর্থাৎ—"অশ্ব, অশ্বতর, গোরু, গাধা, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ ও মেদঃপুচ্ছ (দুম্বা) প্রভৃতি জন্তুগণ গ্রামে বাস করে বলিয়া উহারা গ্রাম্য পশু বলিয়া কথিত হয়।"

গ্রাম্যা বাতহরাঃ সর্ব্বে বৃংহণাঃ কফপিত্তলাঃ ।
মধুরা রসপাকাভ্যাং দীপনা বলবর্দ্ধনাঃ ॥ (সুশ্রুতসংহিতা)

অর্থাৎ—"উপরোক্ত গ্রাম্য জন্তুগণের মাংস বাতহর, বৃংহণ (বর্দ্ধন-শক্তিবিশিষ্ট), কফ-পিত্তজনক, মধুর রস, মধুর বিপাক, অগ্নির দীপক ও বল-বর্দ্ধক।"

বৃংহণঃ কুক্কুটো বন্যস্তদ্বদ্ গ্রাম্যো গুরুস্তু সঃ ।
বাতরোগক্ষয়বমীবিষমজ্বরনাশনঃ ॥ (সুশ্রুতসংহিতা)

অর্থাৎ—"বন্য মোরগের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ বীর্য্য, বাতঘ্ন, বৃষ্য (বীর্য্য বর্দ্ধক), বলকারক এবং বর্দ্ধন-শক্তিবিশিষ্ট। গ্রাম্য মোরগও বন্য মোরগের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অপিচ ইহা গুরু এবং বাতরোগ, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বর নাশক।" সুশ্রুতসংহিতা আরও বলেন,—

শ্বাস-কাশ-প্রতিশ্যায়-বিষমজ্বরনাশনম্ ।
শ্রমাত্যগ্নিহিতং গব্যং পবিত্রমনিলাপহম্ ॥

অর্থাৎ—"গোমাংস শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও বিষমজ্বর নাশক। ইহা শ্রমশীল ও তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যাক্তিগণের হিতকর এবং গব্য মাংস পবিত্র ও বায়ুনাশক।" কেবল মুসলমানদের শরীরেই ঐ সকল মুরগী ও গোমাংসের গুণ প্রকাশ পাইবে, কোন হিন্দুর শরীরে পাইবে না, ইহা হিন্দুদের অখাদ্য ইত্যাদি ভাবের কোন কথা পূর্ব্বোক্ত চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতায় বর্ণিত আছে কি? ঐ সকল গুণবিশিষ্ট মাংসাহার করিলে ঐ সকল ব্যাধিতে আক্রমণ করিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে মেষ, মহিষ, ও মোরগ ইত্যাদি নানাপ্রকার পশু ও পক্ষী এবং মৎস্যাদি আহারের ব্যবস্থাও সেই আয়ুর্ব্বেদেই আছে। সুতরাং এই সকল খাদ্য যদি অখাদ্য বা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারকই হইত, তবে তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিগণ মানব সমাজে কিছুতেই ঐ সকল খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেন না। কাঠ, ইট বা পাথর আহার করার বিষয়ে শ্রুতি বা স্মৃতিশাস্ত্রে কোন বিধি বা নিষেধ কিছুই নাই, যেহেতু

উহা মানুষের অখাদ্য। ঠিক সেইরূপ আমিষ আহার্য্যগুলি যদি মানুষের অখাদ্যই হইত, তবে ঐ কাঠ, পাথরের ন্যায় তৎসম্বন্ধে কোন বিধি বা নিষেধ কিছুই থাকিত না। এই ভারতবর্ষে চিরকাল হইতেই আমিষ আহার প্রচলিত আছে ও থাকিবে। 'আমিষ' এই শব্দকে মূল ধরিয়াই 'নিরামিষ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাকরণের হিসাবেও অগ্রে আমিষ পরে নিরামিষের সৃষ্টি হইয়াছে।

ভোজন যজ্ঞে পশু বধ করার জন্য বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রেও বহু বিধি আছে। তাই মনুসংহিতায় মনু বলিয়াছেন—

যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।

অর্থাৎ—"যজ্ঞে মাংস ভোজন করা বেদেরই বিধান।" যজুর্ব্বেদে উক্ত আছে—

বায়ব্যাং শ্বেতছাগলমালভেত বায়ুযাগে।
পশুনা রুদ্রং যজেত। অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত।

অর্থাৎ—"বায়ু দেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে। রুদ্র-দেবতাকে পশুবলি দ্বারা পূজা করিবে। অগ্নি ও সোম দেবতাকে পশু বলি দিবে।"

মরুতাং স্কন্ধা, বিশ্বেষাং দেবানাং প্রথমাকীকসা, রুদ্রাণাং
দ্বিতীয়াদিত্যানাং তৃতীয়া, বায়োঃ পুচ্ছমগ্নিসোময়োর্ভাসদৌ
ক্রুঞ্চৌ, শ্রোণিভ্যামিন্দ্রবৃহস্পতী, উরুভ্যাং মিত্রাবরুণা,
বল্মাভ্যামাক্রমণং স্থূরাভ্যাং, বলং কুষ্ঠাভ্যাং॥ (যজুর্ব্বেদ)

অর্থাৎ—"অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের স্কন্ধদেশ মরুদ্গণকে, প্রথম অস্থি রুদ্রগণকে, দ্বিতীয় অস্থি আদিত্যগণকে, তৃতীয় অস্থি বায়ু দেবতাকে, পুচ্ছদেশ অগ্নি ও সোম দেবতাকে, ক্রুঞ্চদ্বয় (কোঁচদ্বয়) ও শ্রোণিদ্বয় (নিতম্ব বা পাছা) ইন্দ্র ও বৃহস্পতিকে, উরুদ্বয় মিত্র ও বরুণকে উদ্দেশ করিয়া

হোম করিবে।" অর্থাৎ যজ্ঞীয় পশুগণের শরীরের মধ্যে উত্তম মাংসযুক্ত ঐ সকল অংশ ঐ সকল দেবতাগণের নামে যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে।

বসন্তায় কপিঞ্জলানালভতে। মিত্রায় মৎস্যান্।
সোমায় হংসানালভতে। বায়বে বলকে মিত্রায় মদ্গুণান্।
বরুণায় চক্রবাকান্। অগ্নয়ে কুটরু নালভতে।
বরুণাভ্যাং কপোতান্। (যজুর্ব্বেদ)

অর্থাৎ—"বসন্ত দেবতাকে কপিঞ্জল পক্ষী বলি দিবে। মিত্রকে (সূর্য্যকে) মৎস্য ও সোম দেবতাকে হংস বলি দিবে। বায়ুকে বলকা এবং মিত্রকে মদ্গুর (মাগুর) মৎস্য ও বরুণকে চক্রবাক (চকাপক্ষী), অগ্নিকে কুটরু (কুটরীয়া পেঁচা) এবং বরুণদ্বয়কে কপোত (কবুতর) বলি দিবে।"

ষট্শতানি নিযুজ্যন্তে পশূনাং মধ্যমেঽহনি॥
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য নবভিশ্চাধিকানীতি।
(যজুঃভাষ্যে মহীধরধৃতবচন).

অর্থাৎ—"অশ্বমেধ যজ্ঞে ৬০৯টী পশু মধ্যাহ্নে বলি দেওয়া হয়।"

ছান্দোগ্যোপনিষদ বলিতেছেন,—

অহিংসনং সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ।

আচার্য্য শঙ্কর ঐ শ্রুতির ভাষ্য করিয়াছেন—

অন্যত্রতীর্থেভ্যঃ তীর্থনাং শাস্ত্রানুজ্ঞাবিষয়স্ততোঽন্যত্রেত্যর্থঃ॥

অর্থাৎ—"তীর্থ ভিন্ন অন্যত্র পশু-পাখী বধ করা অনুচিত। শাস্ত্র যে যে স্থলে পশু-পাখী বধের বিধি দিয়াছেন, তাহাই তীর্থ বলিয়া বুঝিবে।" ইহার ভাবার্থ এই যে, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে এবং অতিথি অভ্যাগত আসিলে, মধুপর্কে এবং পোষ্যগণের আহারের জন্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় এবং শাস্ত্রানুমোদিত স্থল ভিন্ন বিনা প্রয়োজনে, পশু-পক্ষী ও মৎস্যাদি বধ

করিবে না। কাত্যায়নসংহিতা বলিয়াছেন—

সপ্ত তাবন্ মূর্দ্ধন্যানি তথা স্তনচতুষ্টয়ম্।
নাভিঃ শ্রোণিরপ্রানঞ্চ গোস্ত্রোতাংসি চতুর্দ্দশ
চরিতার্থা শ্রুতিঃ কার্য্যা যস্মাদপ্যনুকল্পশঃ
অতোহষ্টর্চ্চেন হোমঃ স্যাচ্ছাগপক্ষে চরাবপি
তাবতঃ পায়সান্ পিণ্ডান্ পশ্বভাবেঽপি কারয়েৎ।

অর্থাৎ—"যজ্ঞে হোম করিবার নিমিত্ত গাভীর মস্তকের সাত অংশ, চারিটী স্তন, নাভি, উরু, ও গুহ্য এই চতুর্দ্দশ অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছাগলের পক্ষে অষ্ট স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পশু অভাবে পায়স ও পিণ্ড দ্বারা হোম করিবে।" ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহর্ষি জৈমিনীর 'পূর্ব্ব মীমাংসা' নামক গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্তরূপে যজ্ঞে নানাপ্রকার পশু বধ করিয়া মাংস ভোজন করা বিষয়ক কত শত শত প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি ও সংহিতার শ্লোকদৃষ্টে একমাত্র ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যজ্ঞীয় পশুর শরীরের যে যে অংশের মাংস এবং যে যে মৎস্য ভোজন করিতে সুস্বাদ তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া মুনিগণ শ্রদ্ধা সহকারে সেইগুলিই দেবতাগণের নামে যজ্ঞে আহুতি দিয়া নিজেরা ভোজন করিতেন এবং পরবর্ত্তীগণকেও সেইরূপই করিবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছেন। যোগেশ্বর মহাদেব স্বয়ং পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

সর্ব্বোপচারৈঃ সংপূজ্য বলিং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।
মৃগশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা॥
শল্লকী শশকো -গোধা-কূর্ম্ম-খর্গী দশ স্মৃতাঃ।
অন্যানপি পশূন্ দদ্যাৎ সাধকেচ্ছানুসারতঃ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অর্থাৎ—"হে দেবী! ভক্তগণ একাগ্রচিত্তে পাদ্যাদি সর্ব্বোপচার দ্বারা তোমার পূজা করিয়া বলিপ্রদান করিবে। বলির মধ্যে মৃগ, ছাগ (পাঁঠা)

মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী (সজারু বা সেজা), শশক (খরগোস), গোধা (গুইল), কূর্ম্ম (কচ্ছপ) ও গণ্ডার এই দশবিধ পশুই বলিদানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। সাধকের ইচ্ছানুসারে অন্যান্য পশুও বলিপ্রদান করিবে। দেবতাগণের ভোগের জন্য মৎস্য মাংসাদির বিচার করিয়া পুনরায় স্বয়ং শিবই পার্ব্বতীকে বিশেষ করিয়া তন্ত্রসারে বলিয়াছেন,—

মাংসন্তু ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং জলখেচরভূচরম্।
ত্রিবিধং মাংসং সংপ্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকরকম্।
মৎস্যন্তু ত্রিবিধং দেবি উত্তমাধম মধ্যমম্
উত্তমং ত্রিবিধং দেবি শালপাঠীনরোহিতম্।
প্রবীণং কণ্টকৈর্হীনং তৈলাক্তং বল্কলৈর্যুতম্
দেব্যাঃ প্রীতিকরঞ্চৈব মধ্যমন্তু চতুর্ব্বিধম্।
গোমেষাশ্বলুলাপোহথ গোধাজোষ্ট্রমৃগোস্তবম্
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্।

অর্থাৎ—"দেবি! মাংস ত্রিবিধ, জলচর মৎস্যাদি, খেচর পক্ষী ও ভূচর পশু এই ত্রিবিধ মাংসই দেবতাদিগের প্রীতিকর। হে দেবি! মৎস্যও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার। বৃহৎ, কণ্টক-রহিত, তৈলাক্ত ও ছালযুক্ত (আঁশযুক্ত) শোল, পুঁটী ও রোহিত এই ত্রিবিধ উত্তম মৎস্য দেবীর প্রীতিকর। মধ্যম মৎস্য চারিপ্রকার। গো, মেষ, শ্বলুলা, গোসাপ, উষ্ট্র ও মৃগের মাংস সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং দেবতাদিগের প্রীতিকর।" কালিকা-পুরাণের পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বলিদান বিষয়ে লিখিত আছে :—ভগবান্ বলিলেন,—"দেবীর প্রমোদজনক বলিপ্রদান করিবে। (১ শ্লোক। কেননা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সাধক বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে। (৩ শ্লোক।) পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, নবপ্রকার মৃগ, যথা—বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোসর্প, শশক, বায়স, চমর, কৃষ্ণসার এবং সিংহ,—মৎস্য, স্বগাত্র-রুধির এবং ইহাদিগের অভাবে হয় (ঘোড়া) ও হস্তী এই

আট প্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছাগল, শরভ (মৃগবিশেষ) এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি এবং অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ। (৪ হইতে ৬ শ্লোক।) 'ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞের নিমিত্ত সকল প্রকার বলির সৃষ্টি করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে বধ করি, এইজন্য যজ্ঞে পশু বধ হিংসার মধ্যে গণ্য নয়' (১১ শ্লোক) ইত্যাদিরূপ মন্ত্র সাধক পাঠ করিবে। হে বেতাল ও ভৈরব! দুর্গার সকল প্রকার বলিদানে এই একই বিধি জানিবে এবং পণ্ডিতগণ ইহারই অনুষ্ঠান করিবেন।" (২৩ শ্লোক।)

উক্ত কালিকাপুরাণের ষষ্টিতম অধ্যায়ে, 'কাত্যায়নীর আবির্ভাব' স্থলে লিখিত আছে যে—মোদক, পিষ্টক, পেয়, অনেক প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য, কুষ্মাণ্ড, নারিকেল. খর্জ্জুর, পনস, দ্রাক্ষা, আমলক, শাণ্ডিল্য, প্লীহ, করুণ, কশেরু (কেশুর) হ্রস্বক, মূল, লাজ (খৈ), জম্বু (জাম) এবং তিন্দুক (গাব) ইত্যাদি ফল এবং গব্য, গুড়, মাংস, মদ্য, মধু, ইক্ষুদণ্ড, সর্করা লবণী (লোণাফল) নারঙ্গক, ছাগল, মহিষ, মেষ, নিজের শোণিত, পক্ষী ও পশু, নয় প্রকার মৃগ—এই সকল উপকরণ দ্বারা নিখিল জগতের ধাত্রী মহামায়ার পূজা করিবে এবং এত পরিমাণে বলিদান করিবে যাহাতে মাংস ও শোণিতের কর্দ্দম হয়! (৪৬ হইতে ৫০ শ্লোক।)

ঐ কালিকা পুরাণের সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ে 'বলিদান-বিধি' স্থানে লিখিত আছে:—ভগবান বলিলেন,—"হে পুত্রদ্বয়! (অর্থাৎ বেতাল ও ভৈরব) বলিদানের ক্রম ও স্বরূপ অর্থাৎ যে প্রকার রুধিরাদি দ্বারা দেবীর সম্পূর্ণ প্রীতি হয় তাহা তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি। সাধকগণ সকল প্রকার বলিদানেই বৈষ্ণবীতন্ত্র-কল্পকথিত ক্রম সর্ব্বদা গ্রহণ করিবে। পক্ষীসকল, কচ্ছপ, গ্রাহ (হাঙ্গর বা কুম্ভীর) মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, অজা, আবিক, গো, ছাগ, রুরুমৃগ, শূকর, খড়্গ (গণ্ডার), কৃষ্ণসার, গোসর্প, শরভ (মৃগবিশেষ—এই মৃগের আটটি পাদ, তাহার ৪টী পা ও চক্ষু

ঊর্দ্ধ দিকে অবস্থিত), সিংহ, মনুষ্য এবং স্বীয়গাত্রের রুধির ইহারা চণ্ডিকা দেবী ও ভৈরবাদির বলিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বলিদ্বারা মুক্তি সাধিত হয়, বলিদ্বারা স্বর্গ সাধিত হয় এবং বলিদান দ্বারা নৃপগণ শত্রু নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া থাকেন। মৎস্য ও কচ্ছপের রুধির দ্বারা শিবাদেবী নিয়ত এক মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং গ্রাহ (হাঙ্গর বা কুম্ভীর)দিগের রুধিরাদি দ্বারা তিন মাস কাল তৃপ্তি লাভ করেন। দেবী মৃগ এবং মনুষ্য-শোণিত দ্বারা আট মাস তৃপ্তি লাভ করেন এবং সর্ব্বদা কল্যাণ প্রদান করেন। গোরু এবং গোসর্পের রুধিরে দেবীর সাংবৎসরিক তৃপ্তি হয়। কৃষ্ণসার এবং শূকরের রুধিরে দেবী দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ করেন। অজা, আবিক এবং শার্দ্দূলের রুধিরে দেবীর পঞ্চবিংশতিবার্ষিকী তৃপ্তি লাভ হয়। সিংহ, শরভ (মৃগবিশেষ) এবং স্বীয় গাত্রের রুধিরে দেবী সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। যাহার রুধিরে যাবৎকাল তৃপ্তির কথা হইয়াছে, মাংস দ্বারাও ততকাল তৃপ্তি লাভ হয়। কৃষ্ণসার, গণ্ডার, রোহিত মৎস্য, যুগল বাধ্রীণস এই সকল বলিদানের পৃথক পৃথক ফল শ্রবণ কর। কৃষ্ণসার ও গণ্ডারের মাংসে চণ্ডিকাদেবী পঞ্চশত বর্ষ নিয়ত তৃপ্তি লাভ করেন। আমার পত্নী দুর্গা রোহিত মৎস্যের মাংসে এবং বাধ্রীণসের মাংসে তিন শত বৎসর তৃপ্তিলাভ করেন। শ্বেতবর্ণ বৃদ্ধ অজাপতির (পাঁঠার) নাম বাধ্রীণস, দৈব এবং পৈত্রকার্য্যে ইহার আদর করা হইয়াছে। যাহার গ্রীবা নীলবর্ণ, মস্তক রক্তবর্ণ, চরণ কৃষ্ণবর্ণ এবং পক্ষ শ্বেতবর্ণ এইরূপ পক্ষীরাজকেও বাধ্রীণস বলা হয়, ইহা বিষ্ণু এবং আমার প্রিয়। (১ হইতে ১৮ শ্লোক)। মন্ত্রপূত শোণিত অমৃতরূপে পরিণত হয়। যেহেতু বলির মস্তক এবং মাংস দেবতার অত্যন্ত অভীষ্ট এইহেতু পূজার সময় বলির শির এবং শোণিত দেবীকে দান করিবে। বিচক্ষণ সাধক ভোজ্য দ্রব্যের সহিত লোমশূন্য মাংস দান করিবে এবং কখন কখন পূজোপকরণের সহিতও মাংস দান করিবে। রক্তশূন্য মস্তক (অর্থাৎ পাক করা মাথা) অমৃত তুল্য পরিগণিত হয়।" (২১ হইতে ২৪ শ্লোক।)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ তন্ত্র ও পুরাণোক্ত ঐ সকল শিববাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দেবীর পূজায় পূর্ব্বোক্ত পশু বলিদান দিয়া ভক্তি সহকারে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে তথাকথিত ভক্তগণ সেই সকল শিববাক্যের বিরুদ্ধে দেবকার্য্যে যে কোন প্রকারের পশু-পক্ষী বলি একেবারে রহিত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া তাহা সমর্থন করার জন্য যুক্তিহীন ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কতকগুলি কথার অবতারণা করিয়া বলেন যে 'দেবী ভগবতী বা কালী বিশ্বের মাতা, সুতরাং সেই মায়ের নিকটে তাঁহারই সন্তান পশু, পক্ষী জীবদিগকে বলি দেওয়া মহা পাপকার্য্য' ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সকল বিচারহীন ভক্তগণ শাস্ত্রবিচার ও যুক্তি দ্বারা একবারও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না যে, পরম বৈষ্ণব মহাদেব ও বৈষ্ণবী দেবী ভগবতী সেই তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রের বহু স্থলেই বলিয়া গিয়াছেন যে "আমি অসংখ্য জীব সৃষ্টি করিতেছি এবং আমিই পুনরায় ধ্বংস করিয়া ভোগ করিতেছি'। অর্থাৎ আমিই স্রষ্টা এবং আমিই ভোক্তা। এ-বিষয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতিতেও স্পষ্ট বর্ণিত আছে—

অহমন্নম্ অহমন্নম্ অহমন্নম্।
অহমন্নাদো অহমন্নাদো অহমন্নাদঃ॥

অর্থাৎ—"আমিই অন্ন (খাদ্য) এবং আমিই অন্ন ভক্ষক।"

তাই বলি, হে শাক্ত শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ! তোমরা কি সমস্ত বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য অবমাননা করিয়া, মুখে মুখে কেবল সেই সকল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, নিজ নিজ যুক্তিহীন ভ্রান্ত মতানুযায়ী শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশ ও সমাজকে সর্ব্বপ্রকারে রসাতলে দিতে চাও? শূকর সজারু, গোসর্প (গুইল) কচ্ছপ প্রভৃতি দেবতাগণের উত্তম উপাদেয় খাদ্য বলিয়াই দেবতারা নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন। আজ তোমরা সেই সকল দেববাণী প্রত্যাখ্যান করিয়া সর্ব্বপ্রকার পশু-পক্ষী বলি দেওয়ার প্রথাই একেবারে রহিত করিয়া দেওয়ার জন্য একদল লোক বদ্ধ পরিকর হইয়া বসিয়াছ। যাহার যাহা রুচিকর খাদ্য ঠিক তাহাই খাইয়া সে তৃপ্তি হয়

এবং ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। চিন্তা করিয়া দেখ যে, তোমরাও প্রত্যেকে নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী খাদ্যের ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিয়াই খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক কিনা। ইহা জানিয়া বুঝিয়াও দেবতাগণের অভিপ্রেত পূর্ব্ববর্ণিত বরাহ ও গোসর্প, কচ্ছপাদির মাংস দেবতাগণকে না দিয়া তাঁহাদের অরুচিকর খাদ্য নিরামিষের ব্যবস্থা করিতেছ কেন? কলিযুগ বলিয়াই এইরূপ কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার বাতাস শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতমহাশয়-দের মধ্যেও পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। যদি বলি যে, গোসর্প, কচ্ছপ, সজারু প্রভৃতি বলি দেওয়ার প্রথা এই সমাজে চল নাই; তদুত্তরে বক্তব্য এই,—পূর্ব্বকালে উহা নিশ্চয়ই চল ছিল, নতুবা ঐ সকল বলির বিধি সৃষ্টি হইল কোথা হইতে? পূর্ব্বে চল ছিল, পরে ক্রমে সেই সকল প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও সমগ্র ভারতের দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা ও ভোগ-নৈবেদ্যাদির শাস্ত্র সঙ্গত কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। যেখানে যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেই ভক্ত সেইখানে নিজ রুচিমত ভোগ-নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা করিতেছে। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ,—অঙ্গহীন পশু দেবতার ভোগে দেওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ। অথচ, গৌহাটি (আসাম) কামাখ্যায় 'উমানন্দ শিব' খাসী ও পাঁঠার মাংস ভোজন করেন, কিন্তু তাহা বলি দিয়া নয়। ভোগের জন্য পাঁঠা, খাসী কেহ আনিলেই চারিজন সেবাইত সেই পশু নিয়া শিব মন্দিরের পিছনে চলিয়া যায় এবং দুইজনে সেই ছাগের মাথায়, অপর দুইজনে ছাগের পেটের দিকে ধরিয়া বিরুদ্ধভাবে ঠিক দড়ি পাক দেওয়ার মত মোড়াইতে থাকে; তখন সেই ছাগের গলায় দড়ির মত পাক লাগিয়া মরিয়া যায়। এইভাবে মারিলে একবিন্দু রক্তও সেই ছাগের শরীর হইতে বাহির হইতে পারে না। পরে সেই মৃত ছাগের মাংস রান্না করিয়া ঐ শিবের নিকট ভোগ দেওয়া হয়। ঐ শিবঠাকুর কি অপূর্ব্ব দয়াদ্রচিত্ত, তাই তাঁহার ভক্তগণ দয়ালু বলিয়াই একবারে না কাটিয়া এই অদ্ভুতভাবে পশু মাংস ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের ও আসামের সমস্ত জিলায় শিব মূর্ত্তির

নিকট পাঁঠা বলি হয়, ময়মনসিংহের কোন কোন শিব বাড়ীতে দৈনিক কমপক্ষেও ৬।৭টী পাঁঠা বলি হয় এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ৩০টা হইতে ৪০টা পাঁঠাও বলি হইতে দেখিয়াছি। ঐ জেলায় কোন জমীদার বাড়ীতে শারদীয় দুর্গাপূজায় নবমী দিন বহু পাঁঠা বলির পরে একটা খাসী বলি দেওয়া হয়। নেপালে শীতপ্রধান দেশ বলিয়াই সেখানের শিবঠাকুর পায়রা, শুকর, কচ্ছপ, পাঁঠা এবং মুরগীও ভোজন করেন। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর প্রদেশ, বিহার, বোম্বে, মাদ্রাজ ও গুজরাট প্রভৃতি ভারতের অন্য সমস্ত শিবঠাকুরই সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী। ঐ সকল দেশের ভক্তগণ বলেন, 'শিব পরম বৈষ্ণব, তাই তিনি কি প্রকারে আমিষ ভোজন করিবেন' ?

আসাম ও বঙ্গদেশে কালী মাকে শাক্ত ভক্তগণ পাঁঠা, মহিষ ও মদ ইত্যাদি দ্বারা ভোগ দেন, আর বৈষ্ণব ভক্তগণ বিশুদ্ধ নিরামিষ তিল-তুলসী দ্বারা ভোগ দিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে ও আসামের শীতলা মায়ের নিকট পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, কিন্তু কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের শীতলা মাকে পাঁঠা এবং মুরগীও দেওয়া হয়। কাশীর হিন্দু ও মুসলমান ভক্তগণ বলেন যে, 'কাশীর ঐ শীতলা মা মুরগীর মাংস খুবই ভালবাসেন'। আসাম ও বাংলার লক্ষ্মী মা কোন বাড়ীতে ভক্তের রুচী অনুযায়ী আমিষ, আবার কোন বাড়ীতে নিরামিষ ভোজন করেন। সাধারণ অজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, 'পুরীধামে (উড়িষ্যায়) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে দেওয়াল আছে, সেই সীমানার মধ্যে মৎস্য-মাংসাদি কোন প্রকার আমিষ ভোগের ব্যবস্থা নাই। ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পুরীর পাণ্ডা-গণ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক তাই বহু বৎসর পূর্ব্বে ঐ জগন্নাথদেবের নিকট প্রচুর পাঁঠা, মহিষ বলি হইত। পরে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর সময় পুরীর রাজা ঐ পাণ্ডাদের বিরুদ্ধে অনেক কলহ করিয়া সেই পশু বলির প্রথা উঠাইয়া দেন। কিন্তু এখনও জগন্নাথের মন্দিরের নিকট যে মা বিমলা দেবীর মূর্ত্তি আছে সেখানে শারদীয়া দুর্গাপূজার তিন দিন তিনটা পাঁঠা

বলি দেওয়া হয় এবং বার মাস মৎস্যাদি দ্বারা তাঁহাকে আমিষ ভোগ দেওয়া হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি বিচার করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আহারের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই সমাজ নেতাগণ দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থা ভেদে করিয়াছেন ; সর্ব্বত্র সর্ব্বসাধারণের জন্য একমাত্র নিরামিষ আহার কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

মায়ার সৃষ্টি এই পরিবর্ত্তনশীল জগত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে ও হইবে। মহম্মদ আরবদেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিবার পূর্ব্বে ঐ আরববাসিগণ অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করিত ; খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে গ্রীক, রোমান্ প্রভৃতি দেশবাসিগণ বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজিত। কিন্তু সেই সময় ভারতের হিন্দুগণ কোন মূর্ত্তি পূজা করিতেন না, তাহারা অগ্নির উপাসক ছিলেন—মাত্র হোম করিতেন। কালক্রমে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া এখন সম্পূর্ণ বিপরীতভাব ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল দেব-দেবিগণ আরব ও গ্রীক, রোমান্ প্রভৃতি দেশ ত্যাগ করিয়া ক্রমে এই ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের এই ভারতের মধ্যেও আহার বিষয়ে ঠিক সেইরূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই পুরাকালে মথুরা, বৃন্দাবন ও অযোধ্যা প্রভৃতি হিন্দুস্থানবাসিগণ অর্থাৎ এককথায় বলিতে গেলে তৎকালীন ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুগণ অসংখ্য পশু-পক্ষীর মাংস ও মৎস্য আহার করিতেন। আর এখন ঐ হিন্দুস্থানী—হিন্দুগণ সেই সকল আমিষ আহার করা দূরে থাকুক উহার নাম পর্য্যন্তও মুখে উচ্চারিত হইলে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়। কি ঘোর পরিবর্ত্তন ! তাই আজ হিন্দুস্থানী চারি বেদাধ্যায়নকারী চৌবের এবং তিন বেদাধ্যায়নকারী ত্রিবেদীয় বংশধরগণের মৎস্য মাংস, রসকর পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে মস্তিস্কের শক্তি লুপ্তপ্রায় হওয়ায়, তাহারা ঐ সকল বেদ-বেদান্তের সুগভীর তত্ত্ব মস্তিষ্কে ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশে যাইয়া সাধারণ পদাদির (পেয়াদা) ও পাচকের কার্য্য করিয়া

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সুতরাং পুনরায় সত্যের প্রচার দ্বারা বেদবাণী প্রচার ক্রমে আবার সেই মৎস্য মাংসাহারের প্রচলনকরতঃ সেই সত্য যুগের আবির্ভাব করিয়া ভারতের লুপ্ত শক্তি পুনর্জ্জাগরিত করিয়া এই ভারতকে উদ্ধার করিতে হইবে। সেই সকল বেদবাণী ও মাংসাহারের প্রথা সমাজে চল করাও আমাদের মানুষেরই আয়ত্ত এবং ক্রমে তাহার চেষ্টা করিলেই কোন এক সময়ে যাইয়া সেই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। তাহা না করিয়া তোমরা বরং তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণকরতঃ সমাজে মিথ্যায় প্রচার করিয়া, বর্ত্তমানে ছাগাদি যে সকল পশু বলি দেওয়ার প্রথা সমাজে চলিতেছে তাহাও পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটন করিয়া দিতে চাহিতেছ। ইহাই কি তোমাদের ভক্তি ও জ্ঞানের চরম সীমা? আজকাল সহরে বহুস্থানেই দেখা যায় যে, তথাকথিত তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ভক্তগণ পূজোপলক্ষে শাস্ত্রসম্মত প্রকাশ্য পশুবলি বন্ধ করিয়া দিয়া বাজারের মুসলমান কসাইদের জবাই করা পশু মাংস খাইয়া লোভ রিপু চরিতার্থ করিতেছে। কি সুন্দর ধর্ম্ম, আর কি সুন্দর পবিত্রতা!

বেদের যে সকল স্থানে আহার্য্য বিষয়ে 'ধেনু' ও 'গো' শব্দ উল্লেখ আছে, সংস্কারাবদ্ধ সায়ণাদি ভাষ্যকারগণ সেই সকল স্থানে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ঐ 'ধেনু' ও 'গো' শব্দের 'দুগ্ধ' অর্থ করিয়া মিথ্যা অর্থ গ্রহণে শাস্ত্রের অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছেন। কিন্তু মহীধর স্বামী ভাষ্য করিবার সময় সংস্কারান্ধ সমাজের ভয়ে ভীত না হইয়া তিনি বীরের ন্যায় সত্যার্থ প্রকাশ করিয়া 'গো' শব্দের গরুই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। এখন রামায়ণ মহাভারতাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থালোচনা করিয়া দেখা যাউক যে তৎকালীন সমাজে যজ্ঞাদি দেবকার্য্যে এবং নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে খাদ্যাদির ব্যবস্থা কিরূপ ছিল। মহাভারতে বর্ণিত আছে—

ততো নিযুক্তাঃ পশবো যথাশাস্ত্রং মনীষিভিঃ।
তং তং দেবং সমুদ্দিশ্য পক্ষিণঃ পশবশ্চ যে॥

ঋষভাঃ শাস্ত্রপঠিতাস্তথা জলচরাশ্চ যে।
সর্ব্বাংস্তানভ্যযুঞ্জংস্তে যত্রাগ্নিচয়কর্ম্মণি॥
যূপেষু নিয়তা চাসীৎ পশূনাং ত্রিশতী তথা।
শ্রপয়িত্বা পশূনন্যান্ বিধিবদ্বিজসত্তমাঃ
তং তুরঙ্গং যথাশাস্ত্রমালভন্ত দ্বিজাতয়ঃ॥

(মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব)

অর্থাৎ—"অশ্বমেধ যজ্ঞে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেক দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া শাস্ত্র বিহিত পক্ষী, পশু, ষাঁড় ও জলচর জীবকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া হোম করিলেন। তিন শত যুবকাষ্ঠনিবদ্ধ পশু এবং অন্যান্য পশুকে দ্বিজগণ বিধিপূর্ব্বক বধ করিয়া পরে অশ্বমেধের সেই অশ্বকে বধ করিলেন।" দুর্য্যোধনের গৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোমাংসসম্ভূত মধুপর্ক দ্বারা যে পরিতোষরূপে ভোজন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী শ্লোকেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

তস্মিন্ গাং মধুপর্কঞ্চাপ্যুদকঞ্চ জনার্দ্দনে।

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

অর্থাৎ—"জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে গাভীর মাংসে প্রস্তুত করা মধুপর্ক এবং জল দান করিলেন।"

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ অর্ঘ্যং গাঞ্চ বিধানতঃ।
পিতামহায় কৃষ্ণায় তদর্হায় ন্যবেদয়ৎ॥

(মহাভারত আদিপর্ব্ব)

অর্থাৎ—'‘পুজনীয় পিতামহ শ্রীকৃষ্ণকে পাদ্য, আচমনীয়, অর্ঘ্য এবং গাভীর মাংস যথাবিধি নিবেদন করিলেন।"

রুরূন্ কৃষ্ণমৃগাংশ্চৈব মেধ্যাংশ্চান্যান্ বনেচরান্।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্।
ব্রাহ্মণানাং নিবেদ্যাগ্রমভুঞ্জন্ পুরুষর্ষভাঃ॥

(মহভারত বনপর্ব্ব)

অর্থাৎ—"পুরুষশ্রেষ্ঠ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ রুরুমৃগ, কৃষ্ণমৃগ এবং অন্যান্য বন্য পশুর মাংস, ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে নিবেদন করিয়া ভোজন করিলেন।"

ভুঞ্জানা মুনিভোজ্যানি রসবন্তি ফলানি চ
শুদ্ধবান্ হতানাঞ্চ মৃগাণাং পিশিতান্যপি॥

(মহাভারত বনপর্ব্ব)

অর্থাৎ—"মুনি ভোজ্য সরস ফল ও নিহত মৃগের শুদ্ধ মাংস ভোজন করিলেন।" এইরূপে পঞ্চপাণ্ডবগণ বনবাসকালে নানা প্রকারের গরু, মৃগ ও বরাহাদি অন্যান্য বহু রকমের বন্য পশু হত্যা করিয়া সেই মাংস দ্বারা প্রত্যহই ব্রাহ্মণদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন এবং নিজেরাও ভোজন করিতেন। মহাভারতের একস্থানে বর্ণিত আছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সময় বহু অশ্বাদি পশু, পক্ষী ও মৎস্য হত্যা করিয়াছিলেন। মহারাজ জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করিতে গিয়াছিলেন তখন তিনি নিম্নোক্তরূপে অভ্যর্থিত হইয়া প্রচুর পশু মাংস দ্বারা তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছিলেন।

পাদ্যং প্রতিগৃহাণেদমাসনঞ্চ নৃপাত্মজ
মৃগান্ পঞ্চশতঞ্চৈব প্রাতরাশং দদানি তে।
ঐণেয়ান্ পৃষতান্ন্যঙ্কুন্ হরিণান্ শরভান্ শশান্
ঋক্ষান্ রুরূন শম্বরাংশ্চ গবয়াংশ্চ মৃগান বহূন্।
বরাহান্ মহিষাংশ্চৈব যাশ্চান্যা মৃগজাতয়ঃ
প্রদাস্যতি স্বয়ং তুভ্যং কুন্তিপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। (মহাভারত)

অর্থাৎ—"হে রাজপুত্র! এই পাদ্য এবং আসন গ্রহণ করুন। এই পাঁচ শত মৃগ আপনাকে প্রাতর্ভোজনের জন্য প্রদান করিলাম। ঐণেয় (মৃগবিশেষ), পৃষত (মৃগবিশেষ), ন্যঙ্কুন, হরিণ, শরভ (উষ্ট্র) খরগোস,

ভল্লুক, রুরুমৃগ, সম্বর (মৃগবিশেষ), বনগোরু এবং অন্যান্য বহু রকমের মৃগ ও বরাহ, মহিষ এবং আরও অন্যান্য মৃগ জাতীয় পশুসকল কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং আপনাকে প্রদান করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত নারদ মুনি ভক্তবৃন্দ সহ হরিগুণ গান করিতে করিতে পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বজীবে দয়ালু রাজা রন্তিদেবের গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলে উক্ত রাজা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত গোমাংসাদি দ্বারা যে ঐ সকল অতিথিদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন, মহাভারতে নারদ মুনির উক্তিতেই তাহার প্রমাণ দেখা যায়—

সাঙ্কৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমতিথির্ব্বসেৎ।
আলভ্যন্ত তদা গাবঃ সহস্রাণ্যেকবিংশতিম্ ॥ (মহাভারত)

অর্থাৎ—"সাঙ্কৃতি রাজা রন্তিদেবের গৃহে রাত্রিতে অতিথি বাস করিলে পর তাহাদের সেবার জন্য একুশ হাজার গোরু সংগৃহীত হইয়াছিল।" (সেই পুরাকালে 'হাজার' শব্দের কোন সাঙ্কেতিক সংখ্যা ছিল, বর্ত্তমানকালে যেরূপ সৈনিক বিভাগে ২৫টি সৈন্যে এক শত এবং হস্তী গণনায় ২০টী হস্তীতে এক শত বুঝায়।)

মহারাজ মান্ধাতার গৃহে ব্রাহ্মণগণকে যে প্রচুর পরিমাণ মৎস্যের দ্বারা ভোজন করান হইয়াছিল তৎসম্বন্ধেও মহাভারতে সেই নারদ মুনির উক্তিই আছে—

অদদদ্রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো বিশাম্পতে
বহুপ্রকারান্ সুস্বাদূন্ ভক্ষ্যভোজান্নপর্ব্বতান্। (মহাভারত)

অর্থাৎ—নারদ মুনি বৈশম্পায়নকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, "হে বৈশম্পায়ন! প্রভূত রোহিত মৎস্য এবং বহু প্রকার সুস্বাদু প্রভূত ভক্ষ্য ভোজ্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন।" উত্তরা-বিবাহকালে পাণ্ডবগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে নিম্নলিখিত প্রচুর পশু-মাংস দ্বারা পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়াছিলেন।

উচ্চাবচান্ মৃগান্ জঘ্নুর্মেধ্যাংশ্চ শতশঃ পশূন্
সুরামৈরেয়পানানি প্রভূতান্যুপহারয়ন্। (মহাভারত)

অর্থাৎ—"শিকারলব্ধ উচ্চ শ্রেণীর বৃহৎ নানাবিধ মৃগ ও শত শত অন্যান্য পবিত্র পশু হত্যা করা হইয়াছিল এবং সুরা, মৈরেয় (মদ্য বিশেষ) প্রভৃতি উত্তম পানীয় সকল উপহার প্রদান করিয়াছিল।"

প্রভাস তীর্থে যাওয়ার সময় শ্রীকৃষ্ণ ও তৎসঙ্গীয়গণ নিম্নোক্তরূপে মদ্য মাংসাদি দ্বারা পাথেয় ভোজ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—

তেতা ভোজ্যংচ ভক্ষ্যংচ পেয়ং চান্ধকবৃষ্ণয়ঃ
বহু নানাবিধং চক্রুর্মদ্যং মাংসমনেকশঃ। (মহাভারত)

অর্থাৎ—"অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য মাংস এবং নানাবিধ পানীয় মদ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।" মহর্ষি বাল্মীকি মুনির বর্ণনায় দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র জন্মিবার পূর্ব্বে রাজা দশরথ পুত্রলাভ কামনায় নিম্নোক্তরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন (মূল বাল্মীকি রামায়ণে দেখুন)—

নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্।
উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ॥
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে।
ঋত্বিগ্ভিঃ সর্ব্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা॥
পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা।
অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ॥
কৌশল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য্য সমন্ততঃ।
কৃপাণৈর্ব্বিশশা সৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা॥

(রামায়ণ আদিকাণ্ড)

অর্থাৎ—'মহারাজ দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিকগণ শাস্ত্রবিহিত বহু পশু, সর্প, পক্ষী দ্বারা হোম করিতে লাগিলেন। বহু জলচর জীব

এবং অশ্ব দ্বারাও হোম করিলেন। তিন শত পশু এবং একটী সুলক্ষণযুক্ত উত্তম অশ্ব দ্বারা হোম করা হইল। কৌশল্যা উত্তমরূপে ঐ অশ্বের পরিচর্য্যা করিলে রাজা ঐ অশ্বকে পরম আনন্দের সহিত তরবারি দ্বারা তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।"

বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে বর্ণিত আছে—

মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভক্ষণে।

অর্থাৎ—শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—"হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র এই শুভক্ষণে মৃগ বধ করিয়া আন।"

স লক্ষ্মণঃ কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্।
অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি।
তত্তু পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্॥

অর্থাৎ—"সুমিত্রানন্দন প্রতাপশালী লক্ষ্মণ, সুলক্ষণযুক্ত একটী পবিত্র কৃষ্ণমৃগ বধ করিয়া প্রজলিত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিতরহিত ও পরিপক্ক হইলে ভক্ষণের নিমিত্ত উত্তোলন করিলেন।" অন্য একস্থলে বর্ণিত আছে—

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ॥

অর্থাৎ—"সেই ধীমান রাজপুত্রের বাক্য শুনিয়া ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ গোমাংসের অর্ঘ্য আনয়ন করিলেন।" অন্যত্র বর্ণিত আছে—

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।
বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে॥

অর্থাৎ—"সেস্থান হইতে একক্রোশ মাত্র গমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ অনেক পবিত্র মৃগ হত্যা করিয়া বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।"

ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ভরত অতিথি হইলে তিনি নিম্নোক্তরূপে সেই অতিথির সেবা করাইয়াছিলেন—

আজৈশ্চাবিকবারাহৈর্নিষ্ঠান-রসসঞ্চয়ৈঃ।
ফলনির্য্যাসসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধরসান্বিতৈঃ॥
বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ।
প্রতপ্তপৈঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ুর-কৌক্কুটৈঃ॥
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি।

অর্থাৎ—"ছাগল, মেষ, বরাহ প্রভৃতির প্রচুর মাংস, সুগন্ধ ও সুরস সিদ্ধ ফলনির্য্যাস, বিবিধ প্রকার ভর্জ্জিত (ভাজা) মৎস্য, ময়ুর, মোরগ, প্রভৃতির পবিত্র মাংস যাহার যেরূপ ইচ্ছা ভক্ষণ করিলেন"।

কুশাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিসসাদহ
সীতামাদায়হস্তেন মধুমৈরেয়কং শুচি
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচীমিব পুরন্দরঃ
মাংসানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ।
(রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড)

অর্থাৎ—"ইন্দ্র যেরূপ শচীকে সহস্তে ভোজন করাইতেন, সেইরূপ রামচন্দ্র বিস্তৃত কুশাসনে উপবেশন করিয়া স্বহস্তে বিশুদ্ধ মৈরেয়ক মদ্য (লতা জাতীয় গাছ হইতে প্রস্তুত করা মদ্য), বিবিধ সুমিষ্ট ফল এবং বহু প্রকার পশু মাংসসকল সীতাদেবীকে পান ও ভোজন করাইতেন। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী যে প্রত্যহই মদ্য, মাংস খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেন, উক্ত শ্লোকেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবী যখন বনবাসে ছিলেন তখন ছদ্ম ব্রাহ্মণবেশী রাবণ সীতাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে ভিক্ষা নিতে আসিলে সীতাদেবী সেই ব্রাহ্মণবেশধারী রাবণকে বলিয়াছিলেন—

আগমিষ্যতি মে ভর্ত্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্।
রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু॥
নিহত্য পৃষতঞ্চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ॥
(রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড)

অর্থাৎ—"আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমার পতি রাঘব (রামচন্দ্র) বহু মৃগ, গোসাপ, বরাহ বধ করিয়া এবং অন্য বহু প্রকার মাংস লইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তদ্দ্বারা আপনাকে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইব।" সীতাদেবীর এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সীতাদেবী ও রাম লক্ষ্মণ বনবাসকালে প্রত্যহই ঐসকল পশুর মাংস আহার করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ও অতিথি অভ্যাগত আসিলে তদ্দ্বারা তাহাদেরও ভোজন করাইতেন।

পূর্ব্বোক্ত রামায়ণের শ্লোকগুলির ন্যায় বরাহ, মৃগ ও মোরগ ইত্যাদি নানাপ্রকার পশু পক্ষী বধ করিয়া মাংস ভোজন করা বিষয়ক আরও বহু শ্লোকই বাল্মীকি মুনির বর্ণনায় রামায়ণে দেখা যায়। এই শ্লোকগুলি বাল্মীকি বিরচিত মূল রামায়ণে এখনও দেখিতেছি। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী সংস্কারান্ধ কীর্ত্তিবাস আদি কবিগণ ঐ মাংস অপবিত্র বা অখাদ্য মনে করিয়া, ঐরূপ বহু শ্লোক উঠাইয়া দিয়া, নিজ নিজ মতানুযায়ী নূতন শ্লোক রচনাকরতঃ তাহাতে সীতাদেবী ও রামচন্দ্রের বনবাসকালে ফল-মূলাহারের কথা লিখিয়া সত্যের অপলাপ ও মিথ্যার প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন কবিগণই সত্যের অপলাপ করিয়া 'সত্যযুগে একুশ হাত, ত্রেতাযুগে চৌদ্দ হাত ও দ্বাপরযুগে সাত হাত লম্বা মানুষ ছিল এবং পাঁচ হাজার, দশ হাজার কি লক্ষ বর্ষ লোকের পরমায়ু ছিল; শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন; হনুমান সূর্য্যটীকে আনিয়া বগলের মধ্যে রাখিয়া দিয়া রাত্রি প্রভাত হওয়া বন্ধ করিয়াছিল' ইত্যাদি বহু আজগুবি মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া সমাজের রুচি অনুসারে নিজ নিজ মতানুযায়ী বহু গ্রন্থ ছাপাইয়া তদ্দ্বারা মিথ্যার প্রচার করিয়াছেন এবং ঐ সকল মিথ্যা পুস্তক বিক্রয় দ্বারা নিজ নিজ ব্যবসায়ে আর্থিকোন্নতি ও সমাজে প্রাধান্য স্থাপন করিয়া, সমাজকে অজ্ঞানান্ধকারে ফেলিয়া যাওয়াতেই আজ ভারতের এই দুর্দ্দশা। যদি সেই আদিম গ্রন্থসকলের মূল সত্য তত্ত্বই আজ পর্য্যন্তও সমাজে প্রচার থাকিত, তবে আমিষ ও নিরামিষ আহার

লইয়া এখন হিন্দু সমাজে এই দ্বেষাদ্বেষি, রেষারেষির সৃষ্টি হইত না এবং জাতিগত ও শারীরিক দুর্ব্বলতা আসিয়া অধিকার করিয়া হীনবীর্য্য ও ভীরু, কাপুরুষ সন্তানগণ জন্মিয়া আজ হিন্দুজাতিকে এইরূপ নিস্তেজ করিতে সক্ষম হইত না। অতএব হে কুসংস্কারান্ধ বৈষ্ণব বন্ধুগণ! তোমরা কেন অনর্থক তোমাদের নিজ কুধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রীতিকর নিরামিষ আহার্য্য দ্বারা তাঁহার ভোগ দিয়া, সেই ভগবানের অপ্রীতিভাজন হইয়া নরকে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করিতেছ? মোরগ, গোসর্প ও গরু, বরাহাদির মাংস খাদক সেই বিষ্ণুর অবতারগণ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণাদি, যাঁহাদের নাম স্মরণে তোমাদের দেহ পবিত্র হয়, যদি তাঁহারা স্বয়ং এখন আসিয়া পুনরায় অবতীর্ণ হন, তবে তাঁহাদিগকে তোমরা বৈষ্ণবগণ ও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণগণ স্পর্শ করিবে কি? বা কাহারও গৃহে স্থান দিবে কি? এইরূপ ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস, রামায়ণ ও মহাভারত এবং বেদ-বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রসকল ও সংহিতা, ভাগবতাদি নানাপ্রকারের পুরাণ এবং তন্ত্রগ্রন্থ সকল পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সেকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেই মাংসাহার সাধারণভাবে সর্ব্বত্র যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ঐ সকল গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেই আহার্য্যের শক্তিতেই সেকালের লোকসকল তেজোবীর্য্যশালী ও দীর্ঘকায় এবং শক্তিমান ছিলেন।

তর্কস্থলে অনেকে বলিয়া থাকে যে, 'পূর্ব্বের সেই মুনি ঋষিগণ যজ্ঞ শেষে যজ্ঞে নিহত পশুর জীবন দান দিয়া পুনরায় বাঁচাইয়া দিতেন'। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, 'যজ্ঞে নিহত পশুগণ দেহ ত্যাগের পর স্বর্গে চলিয়া যায়'। কাজেই, যে জীব স্বর্গে গিয়া জীবিত আছে, মর্ত্তলোকে পুনরায় তাহার জীবন দান হইতে পারে না। আর যে ব্যক্তি যজ্ঞে পশু বধ করিয়া সেই মাংসাদি ভক্ষণ করিয়াছেন, মৃত পশুর জীবন দান দিতে যদি তিনি সক্ষম হইবেন, তবে আর বৃথা যজ্ঞ করিয়া পরমেশ্বরের নিকট নিজ পুত্র পৌত্রাদির শতাধিক বর্ষ দীর্ঘায়ু এবং স্বাস্থ্য কামনা করিবেন কেন? আরও দেখ, স্ত্রী-পুরুষ যোগে জীব ভ্রূণজাত হইয়া পরে জন্ম গ্রহণ করে,

ইহাই প্রকৃতির বিধান। কাজেই কেবল যজ্ঞকর্ত্তার কথানুযায়ী বলামাত্রই নূতন একটী জীব সৃষ্টি হইবে, এইরূপ অপ্রাকৃত কথা অযৌক্তিক বলিয়াই অগ্রাহ্য হয়।

কেহ বলে যে, 'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে গোবধ হইয়া থাকিলেও কলিযুগে তাহার বিধি বা প্রচলন নাই'। তবে, জন্মেজয় রাজার গৃহে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া ব্যাসদেব জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বলিতে হইবে কি? ব্যাসদেবের রচিত বেদান্তদর্শনে আছে—

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ (বেদান্তদর্শন)

অর্থাৎ—হিংসাযুক্ত বলিয়া যজ্ঞকে অশুদ্ধ বলা যায় না, কারণ যজ্ঞে পশুবধ করা বিষয়ে শাস্ত্রেরই বিধান আছে। অর্থাৎ ইহা বেদেরই অনুমোদিত এবং তাহা কখনও হিংসা শব্দবাচ্য হইতে পারে না। আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার রচিত ছান্দোগ্য ভাষ্যে এবং ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ইহাই অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন যে, 'শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞে নানাপ্রকার পশু বধ করিলে তাহা কিছুতেই হিংসা শব্দবাচ্য হইতে পারে না,—উহা বেদেরই অনুমোদিত'। মনুসংহিতা বলিয়াছেন—

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোহস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোহবধঃ ॥

অর্থাৎ—"স্বয়ম্ভু স্বয়ংই যজ্ঞকার্য্যের জন্য পশুসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদয় বিশ্বের হিতের জন্যই যজ্ঞ বিহিত। অতএব যজ্ঞে যে পশুবধ তাহা অবধ। অর্থাৎ তত্তৎ স্থলে বধজন্য পাপ হয় না।"

এই সকল ব্যক্তিগণও কোন যুগে বা কোন কালে পশুবধ নিষেধ বলিয়া কোনই উল্লেখ করেন নাই। কেবল নিরামিষাহারী ধর্ম্মধ্বজিগণ সত্যার্থ গোপন করিয়া নিজ মত পোষণের জন্য ব্যাকরণের আশ্রয় গ্রহণে শাস্ত্রার্থকে অনর্থ করিয়া, মিথ্যা ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণ অজ্ঞের মনে কুসংস্কারের আগুন জ্বালিয়া দিতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আদেশ আছে—

স য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শুক্লো জায়েত বেদমনুব্রুবীৎ
সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি ক্ষীরৌদনং পাচয়িত্বা
সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥

অর্থাৎ—"কোন লোক যদি ইচ্ছা করে যে, আমার পুত্রটী গৌরবর্ণ হউক, চারিটী বেদের মধ্যে এক বেদ অধ্যয়ন করুক এবং সম্পূর্ণ শতবর্ষ আয়ু লাভ করুক, তাহা হইলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে দুগ্ধ দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া ঘৃতাক্তকরতঃ তাহা ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলেই তাদৃশ পুত্র উৎপাদনে সম্যক সামর্থ্য জন্মিবে।"

অর্থ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে কপিলপিঙ্গলো জায়েত—
দ্বৌ বেদাবনুব্রুবীৎ সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি দধ্যোদনং পাচয়িত্বা
সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥

অর্থাৎ—"যদি কেহ কামনা করে যে, আমার পুত্রটী কপিল পিঙ্গল বর্ণ হয়, দুইটি বেদ অধ্যয়ন করে, ও পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দধি দ্বারা অন্ন পাক করাইয়া সেই দধ্যোদন ঘৃতাক্ত করিয়া জায়া ও পতি উভয়ে ভক্ষণ করিবে। তাহাতেই তাদৃশ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইবে। দ্বিবেদাধ্যায়ী পুত্রলাভের কামনায় এইরূপ ভোজনের নিয়ম বিহিত হইল।"

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে শ্যামো লোহিতাক্ষো জায়েত
ত্রীন্ বেদাননুব্রুবীৎ সর্ব্বমায়ুরিয়াদিত্যুদৌদনং পাচয়িত্বা
সর্পিষ্মন্তমশ্নীয়াতা মীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ॥

অর্থাৎ—"অপিচ কেহ যদি ইচ্ছা করে যে, আমার একটী শ্যামবর্ণ, রক্ত-চক্ষু-যুক্ত পুত্র জন্মে, পরে ত্রিবেদাধ্যায়ী হয় এবং সম্পূর্ণ শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে কেবল জল দ্বারা অন্নপাক করাইয়া তাহা ঘৃতাক্তকরতঃ ভক্ষণ করিবে। ইহাতেই সেইরূপ পুত্র সন্তান লাভ করিতে সমর্থ হইবে।" এ স্থলে যে জলের উল্লেখ করা

হইয়াছে তাহা অন্য দ্রব্যের মিশ্রণ নিবারণের জন্য। (অর্থাৎ কেবল ঘৃতে চাউল সিদ্ধ হয় না, তাই মাত্র চাউল সিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত সামান্য পরিমাণ জল দিয়া পরে অধিক পরিমাণে ঘৃত দিবেন। বর্ত্তমান যুগে যাহাকে 'পোলাউ' বলা হয়।)

অথ য ইচ্ছেৎ পুত্রো মে পণ্ডিতো বিজিগীথঃ সমিতং গমং শুশ্রূষিতাং বাচং ভাষিতা জায়েত সর্ব্বান্ বেদাননুব্রুবীৎ সর্ব্বমায়ুরিয়াদিতি। মাংসৌদনং পাচয়িত্বা সর্পিষ্মন্ত— মশ্নীয়াতামীশ্বরৌ জনয়িতবৈ ঔক্ষেণ বা ঋষভেণ বা॥

(উক্ত মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য)

মাংসৌদনং মাংসমিশ্রৌদনং তন্মাংসনিয়মার্থ মাহ ঔক্ষেণ বা মাংসেন। উক্ষা সেচনসমর্থঃ পুঙ্গব স্তদীয়ং মাংসম্। ঋষভ স্ততোঽপ্যধিকবয়স্তদীয়মার্ষভং মাংসম্।

অর্থাৎ—"যদি কেহ ইচ্ছা করে যে, আমার পণ্ডিত, দিগ্বিজয়ী, সভ্য হইবার উপযুক্ত সুমধুর ভাষী, এবং অর্থ গাম্ভীর্য্য সম্পন্ন, বাক্যের অভিভাষক ও সর্ব্ব বেদাধ্যায়ী একটী পুত্র হউক, তবে সেই দম্পতিযুগল মাংসমিশ্রিত অন্ন পাক করাইয়া ঘৃতাক্তকরতঃ ভোজন করিবে।" এখানে যে মাংসের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ বক্তব্য এই যে, উহা উক্ষ অর্থাৎ রেতঃসেকসমর্থ তরুণ বয়স্ক বৃষ এবং ততোধিক বয়স্ক বৃষের মাংসই গ্রাহ্য।

অতএব শ্রাদ্ধ যজ্ঞাদি কার্য্য বিনাও যে ঘৃতাদি অন্য প্রকার খাদ্যের ন্যায় গোমাংসাহার তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহা ঐ সকল শ্রুতি ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণেই প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং হে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ! তোমরা আর্য্যজাতি ও আর্য্য সন্তান বলিয়া যদি অভিমান কর, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্বকালের সেই গো-খাদক আর্য্যদের শুক্র শোণিত প্রবাহ এখনও তোমাদের শরীরে বহিতেছে, সুতরাং গো-খাদক এই খৃষ্টান ও মুসলমান জাতিদিগকে ঘৃণা কর কেন? কেনই বা উক্ত জাতিদ্বয়ের খাদ্যকে অখাদ্য ও অস্পৃশ্য আহার

বলিয়া বৃথা আব্দার উপস্থিত করিয়া, হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান জাতির মধ্যে বিদ্বেষের আগুণ জালিয়া দিয়া তাহাতে এই ভারতকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতেছ ?

উক্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঐ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে 'উক্ষা' বা 'ঋষভ' শব্দে 'বৃষ' বা 'ষাঁড়' অর্থ বুঝায়। 'মাংসৌদন' শব্দে ঐ গোমাংসকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কূট তার্কিকেরা ঐ 'উক্ষা' ও 'ঋষভ' শব্দের অন্য প্রকার অর্থ করিলে সেস্থানে লিখিত ভাষার সামঞ্জস্য থাকে না। তথাপি পাণ্ডিত্যাভিমানী নিরামিষভোজী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মধ্বজিগণ শঙ্করাচার্য্যের সেই ভাষ্যার্থের বিরুদ্ধে নিজ মত পোষণের জন্য ব্যাকরণের সাহায্যে 'উক্ষা' শব্দের 'বার্ত্তাকু' (বেগুন) অর্থ করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়া মিথার প্রচার করিয়াছেন। 'মাংসৌদন' শব্দে মাংসের অর্থ না করিয়া উদ্ভিদের ব্যবস্থা, অর্থাৎ 'বার্ত্তাকুর মাংস' (বেগুনের মাংস) এইরূপ অর্থ করিলে ভাষা বিপর্য্যস্ত হইয়া অনর্থ ঘটে। কুতার্কিকগণ ইচ্ছা করিলে ব্যাকরণের সাহায্যে পাগলের বা শিশুদের অসংলগ্ন ও অর্থহীন বাক্যকেও গভীর অর্থযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানী মহাপুরুষগণ কিছুতেই ঐরূপ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখ, মনে কর সামান্য আহার দ্বারা যে দম্পতির দেহ ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইয়া পরে, তাহাদের সুস্থ ও বীর্য্যবান পুত্র জন্ম গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেইজন্যই ঐ বৃহদারণ্যক উপনিষদে শ্রুতি পরম্পরাক্রমে দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত ইত্যাদি গোরসসম্ভুত যে খাদ্য তাহাকে শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষাও মাংসাহারকে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এখন ভাবিয়া দেখ যে, দুগ্ধ ঘৃতাদি আহার্য্যের শক্তিতে যদি শ্রেষ্ঠতম পুত্র না জন্মে, তবে ঐ কূট তার্কিকের আদেশে অসার বেগুন আহার করিলে কি তাহার শক্তিতে কখনও ঐরূপ শ্রেষ্ঠতম পুত্র জন্মিতে পারে? 'দুগ্ধ ও ঘৃতাদির শক্তি অপেক্ষা অসার বেগুনের শক্তি অধিক' এইরূপ উক্তি প্রলাপবচন মাত্র। এতৎসম্বন্ধে

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র দ্রব্যগুণে কি বলেন, তাহা দেখিলেই সর্ব্বসাধারণের ভ্রান্তি দূর হইবে।

ঐ সকল শ্রুতির মত বর্ত্তমান গোখাদকগণ ও ছাগাদি মাংসভোজিগণ যথার্থ জ্ঞান করিবে বটে কিন্তু হিন্দুগণ সর্ব্বদাই গোবধের পাপের ভয়ে মুহ্যমান হইয়া থাকে। কাজেই ঐ শ্রুতি বাক্য মতে গোবধ করা দূরে থাকুক, গোহত্যার কথা মুখে আনিলেও তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিবার প্রয়োজন হয়। অথচ ঐ সকল হিন্দুগণই আবার ঐ শ্রুতিকে 'স্বয়ং ব্রহ্ম বাক্য ও তাহা ধ্রুব সত্য' বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। অতএব গো, মহিষ, ছাগাদি পশু বধ করা বিষয়ে একদিকে শ্রুতিতে স্বয়ং ব্রহ্মার আদেশ বা বিধি বাক্য রহিয়াছে, আবার পক্ষান্তরে আধুনিক গ্রন্থ সমূহে ঐ সকল পশুহত্যা মহাপাপ কার্য্য বলিয়া নিষেধাজ্ঞা আছে। এই অবস্থায় হিন্দুগণ উভয় শঙ্কটে পড়িয়া, কোন্ শাস্ত্র মত সমর্থন করিবেন তৎসম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অনেক স্থলে বহু ব্যক্তিই কোন কোন শব্দের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন।

অনেকে বলিয়া থাকে যে, 'আমিষ আহারে তমোগুণ বৃদ্ধি পায়'। কিন্তু সমস্ত বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণাদি খুঁজিয়াও তাহার কোনই যুক্তি বা নিদর্শন পাওয়া যায় না। মৎস্যমাংসভোজী যীশুখৃষ্ট ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করিবার সময় তাঁহার শত্রুগণকে হাসিমুখে ক্ষমা করিয়াছিলেন। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেবাদি বিষ্ণু-অবতারগণ যে মাংসভোজী ছিলেন, রামায়ণে, মহাভারতে ও বুদ্ধদেবের জীবনীতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। অতএব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞ মুনি ঋষিগণকে এবং যীশুখৃষ্ট, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেবাদি মাংসভোজী মহাত্মাগণ যদি সত্ত্বগুণান্বিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে আমিষ আহারে 'তমো-আধিক্য হয়' বল কি প্রকারে? কাজেই উক্ত মহাত্মাগণ এবং পূর্ব্ব মুনিঋষিগণ তমোগুণান্বিত বলিয়া নির্ণীত না হইলে, আমিষ আহারও তমোগুণান্বিত বলিয়া নিরূপিত হইতে পারে না। জীবের দেহ ও উদ্ভিদাদি এই সমস্তই মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ-

ভূতে সৃষ্ট। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণে মন সৃষ্ট। জীবের দেহে এই গুণত্রয় প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু উদ্ভিদের দেহে সত্ত্ব ও রজোগুণের কোনই প্রকাশ নাই, মাত্র ঘোর তমোগুণেরই প্রকাশ রহিয়াছে। আমিষ ও নিরামিষ এই জড় খাদ্যের গুণাগুণ যদি মনে সংক্রামিত হয় বলিয়া স্বীকার কর, তবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, আমিষ আহারে সত্ত্ব ও রজঃ এবং নিরামিষে তমোগুণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেইজন্যই ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশী আমিষভোজিগণ সজীবতা ও তেজস্বীতার পরিচয় দিতেছে, আর আমরা নিরামিষাহারী ভারতবাসিগণ নিশ্চেষ্ট স্থাবরের ন্যায় মৃতবৎ পড়িয়া আছি।

কেহ বলে, 'বর্ত্তমান কলিযুগে লোকের পরিপাক-শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে সুতরাং মাংস-মৎস্যাদি গুরুপাক দ্রব্য এখনকার লোকের হজম হইবে না'। এই কলিযুগ কি কেবল ভারতেই আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে? অজ্ঞানতার নামই 'কলি'। তাই যেখানে জ্ঞানের বিকাশ হয়, অজ্ঞানতা বা কলি তথা হইতে পলায়ন করে। মনে কর, মাসাধিক কাল অনাহারে থাকায় যে রোগীর পাকস্থলী ও দেহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিশালী করিতে যাইয়া চিকিৎসক কি তাহার অন্নাহার করা বন্ধ করিয়া দেন? বরং সে অল্প পরিমাণে ভাত ইত্যাদি পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক জিনিষ খাইতে খাইতে ক্রমে তাহার পাকস্থলী ও দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিছুদিন পরে সেই রোগী পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধসের চাউলের ভাত বা অর্দ্ধসের রুটিও খাইয়া হজম করিতে সক্ষম হয়। ঠিক তদ্রূপ, যে যতটুকু হজম করিতে সক্ষম, মাত্র ততটুকু মাংসাহার করাই তাহার পক্ষে সঙ্গত এবং তাহাতেই ক্রমে শক্তি বৃদ্ধি হইয়া কালে সে অর্দ্ধসের মাংসও হজম করিতে সক্ষম হইবে।

আবার কেহবা বলিয়া থাকে—'ভারতবর্ষ গরম প্রধান দেশ, এখানে মাংসাহারের উপযুক্ত স্থান নয়'। খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি কি বিলাতে বসিয়া কেবল বিলাতের শীত-

প্রধান জল বায়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছিল? উহা ভারতবাসী আর্য্য ঋষিদেরই বর্ণিত বিষয় এবং এই ভারতে বসিয়াই তাঁহারা মাংসাহার করিতেন। অযোধ্যা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের স্থানগুলি বাংলাদেশ অপেক্ষা যে অত্যধিক গরম প্রধান তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবগত আছেন। ঐ সকল গরম প্রধান স্থানে বসিয়াই সেকালের লোকেরা পূর্ব্ববর্ণিত শূকর, মহিষ ও মুরগী ইত্যাদি নানাপ্রকার পশু পক্ষীর মাংসাহার করিয়া সুস্থ সবল দেহে জীবন যাপন করিতেন।

বংশপরম্পরাক্রমে নিরামিষভোজী যে কোনও জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে, আমিষভোজী অপেক্ষা সত্বগুণান্বিত বলিয়া দেখা যায় না। তৃণভোজী ছাগল, মহিষ, হরিণ ও বানর প্রভৃতি পশুগণ এবং পক্ষিগণ, মাংসভোজী সিংহ, ব্যাঘ্র হইতে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ দেখা যায় যে, ঐ সকল তৃণভোজী পশু-পক্ষিগণ ভয় ও কামক্রোধাদিযুক্ত প্রবল তমোগুণান্বিত। অপর দিকে সিংহ ব্যাঘ্রগণ উহাদের তুলনায় জিতেন্দ্রিয় ও বীর। হস্তী, মহিষাদি তৃণভোজী পশুগুলি এত বলবান হইয়াও উহাদিগকে ভার বহন এবং খাদ্য আহরণের জন্য ভৃত্যের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্রাদি মাংসভোজী পশুগণ অন্যের আনুগত্য স্বীকার করে না। যদিও অতি কষ্টে বহু কৌশলে মানুষ উহাদের কোনটিকে আবদ্ধ করে, তথাপি সেই বদ্ধাবস্থায়ও উহাদের তেজ বিক্রম প্রতিহত হয় না। পশুদের রাজ্য বন, সেখানে ঐ মাংস-ভোজী সিংহাদি পশুই 'পশুরাজ' বলিয়া অভিহিত হইয়া রাজত্ব করিতেছে। অপর দিকে মানব সমাজেও দেখা যায় যে, আমিষ-ভোজী ইংরেজ প্রভৃতি দেশবাসীই শৌর্য্য-বীর্য্যে দিনদিন উন্নতি লাভ করিতেছে, আর নিরামিষ আহারী হিন্দুজাতি হীনবীর্য্য হইয়া ক্রমে কাপুরুষতা প্রাপ্ত হইতেছে। শ্রুতি (বেদান্ত) বলিতেছেন—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

অর্থাৎ—"শারীরিক ও মানসিক বলহীন কাপুরুষ ব্যক্তি কখনও সেই পরমাত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারে না।" ব্যবহারিক জগতেও অর্থোপার্জ্জন দ্বারা স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতে হইলে শৌর্য্য-বীর্য্যের দরকার। কাজেই তেজোবীর্য্যহীন কাপুরুষ ব্যক্তির পক্ষে ব্যবহারিক জগতের ভোগ কিংবা পারমার্থিক জগতের যোগ করা, এই উভয়ই অসম্ভব। প্রার্থনা, ক্রন্দন, স্তুতি-নতি যাহাদের সাধনের অঙ্গ এবং হীনতা, দীনতা, ভয় ও দুর্ব্বলতাই যাহাদের সত্বগুণের লক্ষণ, আর মস্তিষ্ক আলোড়নপূর্ব্বক পরম তত্ত্ব নিরুপণ করা যাহারা নিষ্প্রয়োজন বোধ করে অর্থাৎ দেহ ও মস্তিষ্কের বলবীর্য্য এবং ওজস্বীতা যাহাদের ধর্ম্মবিরোধী, সেই কাপুরুষ ধার্ম্মিকদের পক্ষেই মাত্র আমিষ আহার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে এবং ধর্ম্মের সঙ্গে আহারের কি সম্বন্ধ আছে, আহার কত প্রকার, এই সকল বিচার যে-সকল অজ্ঞানীদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না, মাত্র সেই সকল অধার্ম্মিক মূর্খদের দ্বারাই আজ ভারতের হিন্দুসমাজ হীনবীর্য্য হইয়া মাত্র কতকগুলি কুসংস্কারের ডিপো হইয়া রহিয়াছে।

মনুসংহিতার প্রক্ষিপ্ত শ্লোক।

মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া আমিষ-ভোজনের বিধি প্রতিষেধ বিষয়ে যে সকল শ্লোক আছে, তন্মধ্যে বিধি-বাক্যগুলি প্রকৃত গ্রন্থকাররের লেখা বলিয়াই সেগুলি নিয়মানুসারে শ্রেণী-বদ্ধরূপে ভাষার সামঞ্জস্য রাখিয়া, অর্থ প্রকাশ পাইয়া, আদি অন্তে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আর, অসংলগ্ন ও দ্ব্যর্থযুক্ত কতিপয় প্রতিষেধ বাক্য পূর্ব্বাপর ভাষার ও অর্থের সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যভাবে স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন রকমে

যোজনা করা হইয়াছে। এই সকল অসংলগ্ন শ্লোকগুলি যে কিছুতেই মূল গ্রন্থকারের লিখিত নয়, উহা পরবর্ত্তী কবিদের প্রক্ষিপ্ত, তৎসম্বন্ধে সেই শ্লোকগুলির ভাষার ও অর্থের পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য দেখিয়া পাঠকমাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। তথাপি 'সেই প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলি পূর্ব্ব হইতেই ছিল' বিচারহীন অজ্ঞগণ মনে এইরূপ ধারণা করিয়া লইয়া 'অবৈধ আমিষে নিষেধ আছে' এইরূপ শ্লোকের অর্থ করিয়া, মাত্র ঐ সকল কথা অবলম্বন করিয়াই 'আমিষভোজন অশাস্ত্রীয়' বলিয়া নিরামিষ-ভোজিগণ বৃথা বাদানুবাদ করিয়া থাকে।

ঐ পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও দৃষ্ট হয় যে, "মাংস-ভোজিগণ যে সকল পশুকে বধ করিয়া মাংস খাইবে, পরজন্মে পুনরায় ঐ পশুগণ মাংসভোজীদিগকে ভক্ষণ করিবে।" যদি এইরূপ ব্যবস্থাই হয়, তবে পূর্ব্বজন্মের মাংসভোজীগণই এই জন্মে ভক্ষ্যরূপে হত হইতেছে এবং তার পূর্ব্বজন্মেও ঐ ভোক্তা ছিল ভক্ষ্যরূপে, আর, ভক্ষ্য ছিল ভোক্তারূপে। ইহাই যদি স্থির হইল, তবে ইহার আদি অন্ত কোথায়? এইরূপ অবস্থা ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতে থাকিলে এই 'অনবস্থা' দোষযুক্ত মত কখনও প্রামাণ্য হইতে পারে না। প্রথম ভোক্তার অপরাধে ভক্ষ্য জীব বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া ভোজ্য ভোক্তারূপে পুনঃপুনঃ দুঃখ ভোগ করিতেছে। কি সুন্দর যুক্তিযুক্ত বিচার! ভোজ্য ও ভোক্তা এই উভয়ের মধ্যে যদি এইরূপ সম্বন্ধই স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে অনন্তজন্মেও উহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারই মুক্তি হইতে পারিবে না। শ্রুতির যুক্তিতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জীবের কর্ম্ম ফলানুসারে মানুষ উদ্ভিদ্‌যোনী এবং উদ্ভিদ্‌ও মানবযোনী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মনুস্মৃতির ভোজ্য ও ভোক্তার নিয়মানুসারে এখানেও দেখা যায় যে, নিরামিষভোজী মানবগণের উদ্ভিদ্ ভোজনের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে তাহাদিগকে এই দুর্ল্লভ নরজন্ম ত্যাগ করিয়া পুনঃপুনঃ নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষ্যরূপে গণ্য হইতে হইবে এবং পূর্ব্ব

জন্মের সেই ভক্ষ্য উদ্ভিদ্‌গণ ভোক্তারূপে নরদেহ ধারণ করিয়া পূর্ব্বজন্মের ভোক্তাকে ভোজন করিবে। কি চমৎকার শাস্ত্রের ব্যবস্থা!

প্রথমে জৈন সম্প্রদায় এবং পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্বীয় অভিমতানুযায়ী শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে অনেক প্রক্ষিপ্ত বাক্যসকল যোজনা করিয়া দিয়া নানাস্থানে বিরুদ্ধার্থ করিয়া সত্যের অপলাপকরতঃ দেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। অতএব হে ভারতবাসী হিন্দু বন্ধুগণ! তোমাদের আদিশাস্ত্র বেদ, বেদান্ত ও আয়ুর্ব্বেদের সত্য তত্ত্বাবগত হইতে না পারায় সেই সত্যপথ ভ্রষ্ট হওয়াতেই আজ তোমরা হীনবীর্য্য হইয়া নিকৃষ্ট তমোগুণাবস্থায় আছ। এখন তেজোবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর মাংসাদি আহার করিয়া শরীরের শক্তি বৃদ্ধিকরতঃ শ্রেষ্ঠ রজোগুণ লাভ করিতে সতত চেষ্টা কর। এই রজোগুণ লাভে সক্ষম হইলেই পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্বগুণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তমঃ হইতে ক্রমে রজো লাভ না করিয়া একেবারে কেহই সত্ত্বগুণ লাভ করিতে পারে নাই ও পারিবে না।

জীবহত্যায় পাপ হয় কিনা।

যাহারা জানে না যে, 'জীবহত্যা' এই শব্দটীই সত্য হইতে পারে না, মাত্র তাহারাই বলিয়া থাকে 'আমিষ আহারে জীবহত্যা-জনিত পাপ হয়'। কঠোপনিষদ্ বলেন,—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

অর্থাৎ—"হত্যাকারী ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি (অমুককে) হনন করিব এবং হত ব্যক্তিও যদি মনে করে যে আমি হত হইয়াছি, তবে তাহারা উভয়েই আত্মার তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কারণ এই আত্মা অপরকে হনন করেন না এবং নিজেও অপর কর্তৃক হত হন না।" কঠোপনিষদ্ আরও বলেন,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ, নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

অর্থাৎ—"আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি জানে যে, এই আত্মা জন্মে না অথবা মরে না; আত্মাও কোন কিছু হইতে জন্মে নাই। এই হেতু এই আত্মা অজ (জন্ম রহিত) নিত্য, শাশ্বত (নির্ব্বিকার) ও পুরাণ অর্থাৎ দেহ প্রবিষ্ট বা চিরবর্ত্তমান। দেহ নিহত হইলেও তিনি নিহত হন না।"

গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অর্থাৎ—"শস্ত্রসকল ইহাকে (আত্মাকে) ছেদন করিতে, অগ্নি ইহাকে পোড়াইতে, জল ইহাকে ভিজাইতে এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না।" গীতা আরও বলেন,—

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এবচ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ॥
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে॥

অর্থাৎ—"এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য (পঁচিবার অযোগ্য) এবং অশোষ্য (শুষ্ক হইবার নয়), ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। ইনি অব্যক্ত ও অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হন।"

পূর্ব্বোক্ত কঠ-শ্রুতির এবং গীতায় ভগবানের বর্ণনায় সহজেই বুঝিতে পারিতেছ যে, সেই অজ, নিত্য আত্মাকে কেহই অগ্নিতে দগ্ধ করিতে বা

অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে পারে না। তিনি সর্ব্ব জীবদেহে এবং উদ্ভিদে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাই লোকে বলিয়া থাকে—'যত্র জীব তত্র শিব' অর্থাৎ জীব ও শিব বা আত্মা অভেদ।

ভক্ত বন্ধুগণ!

ভ্রমে প'ড়ে ভাবিতেছ ঈশ্বর বহু দূরে,
অন্তরে আছেন তিনি তথাপি না দেখ তাঁরে।
মনকে যেদিন তুমি চিনিতে পারিবে,
তোমাতে ঈশ্বরে কোন ভেদ না রহিবে ॥

একদা বেদ-বেদান্তজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ কোন মুনির নিকট তাঁহার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "প্রভু! 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের বাণী এবং আপনিও তাহাই আমাকে উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি কি প্রকারে আমাকে প্রাণী বধ করিয়া মৎস্য মাংসাদি আহার্য্য গ্রহণের অনুমতি দিতেছেন?" তদুত্তরে মুনি বলিয়াছিলেন, 'হিংসা' ও 'বধ' এই শব্দ দ্বয়ের অর্থ এক নয়। এই দুইটির পার্থক্য তোমরা সম্যক বুঝিতে না পারাতেই মৎস্য-মাংসাহার করিতে যাইয়া নানাপ্রকার কুতর্কের সৃষ্টি করিয়া থাক। কোন জীবকে অনর্থক পীড়ন করা, বা পরের অনিষ্ট সাধনের জন্য যে চেষ্টা বা চিন্তা করা, অথবা নিষ্প্রয়োজনে কোন প্রাণী বধ করার নাম 'হিংসা'। যেমন অনেক অজ্ঞ লোকে কাক ধরিয়া তাহার গলায় কোন ভার বান্ধিয়া ছাড়িয়া দিয়া তামাসা দেখে, অথবা বিনা প্রয়োজনে পশু পক্ষী প্রভৃতি কোন জীবকে বধ করে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া মনে হিংসা উদ্রিক্ত হইয়া তাহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ইচ্ছুক হয়, ইত্যাদি পরশ্রী কাতরতার কার্য্যগুলি 'হিংসা' শব্দ বাচ্য। শ্রীমদ্ভগবদ গীতার দশম অধ্যায়ে এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রেও হিংসা শব্দে পূর্ব্বোক্তরূপে অনর্থক পরপীড়নকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ খাদ্যের জন্য যে কোনও প্রাণী বধ করিলে তাহা হিংসা শব্দ

বাচ্য বা তাহাতে হত্যাজনিত পাপ কিছুতেই হইতে পারে না,—ইহাই বেদ বাণী। যেখানে ক্রোধাদি কোন রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কোন প্রাণী বধ করা হয় অথবা যে সকল জীবের মাংস আমাদের খাদ্যাদি কোন প্রয়োজনেই আসে না, ঐরূপ কোন জীব হত্যা করিলে ঐ সকল স্থানেই হিংসাজনিত পাপ হইতে পারে। এখন স্মরণ করিয়া দেখ, খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তোমরা যখন ছাগাদি পশু বধ কর বা দেবতাগণের পূজায়ও যখন পশু বলি দেও, তখন সেই পশুর উপর তোমাদের মনে কোন প্রকার ক্রোধাদির উদয় হয় কি? বরং সেই উত্তম খাদ্য মাংস দেখিয়া তোমাদের মনে সত্ত্বগুণের লক্ষণ অত্যন্ত আনন্দেরই উদ্রেক হইয়া থাকে। সুতরাং সেখানে কখনও হত্যা বা হিংসাজনিত পাপ হইতে পারে না।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমাদি মায়ার খেলা যাহা কিছু দৃষ্টি গোচর হইতেছে উহার একটীর বিনাশ হইয়া নূতন আর একটীর সৃষ্টি হয়, অথবা একটি ধ্বংস হইয়া অন্যের খাদ্যরূপে গণ্য হইয়া তাহার দেহের পুষ্টি-সাধন করে। এইরূপ স্বাভাবিক ক্রমে এক জীব অন্য জীবের আহার্য্যরূপে পরিণত না হইলে আমিষ কি নিরামিষ কোন প্রকারেই আহার করা যায় না। দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ইত্যাদি দ্রব্যগুলি আহার্য্য মধ্যে সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ নিরামিষ বলিয়া অনেকে গণ্য করেন বটে কিন্তু গোরসসম্ভূত এই দুগ্ধাদি দ্বারা ভোজন করিলে তাহা নিরামিষ কি আমিষ ভোজন হইল তৎসম্বন্ধে নিরামিষভোজিগণ বিচার করিয়া দেখিয়াছেন কি? দধি ও ঘৃতাদি দুগ্ধ হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই দুগ্ধ আবার গোরুর শরীরেরই রক্ত হইতে জাত। কারণ গর্ভস্থ ভ্রূণের খাদ্যই মায়ের শরীরের রক্ত, ঐ ভ্রূণ প্রসূত হওয়া মাত্রই মায়ের শরীরে রক্ত দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া স্তন দ্বারা নির্গত হয়।

পশু রক্ত হইতেই মাংস ও দুগ্ধ উদ্ভূত হয়। অন্যদিকে গোবৎসের পানীয় দুগ্ধ স্বীয় প্রয়োজনের জন্য আহরণ করিয়া লওয়ায় ঐ বৎস দুগ্ধাভাবে মৃত-প্রায় হয়, কখনও বা মরিয়াই যায়। গোয়ালাদের গোশালা ইহার প্রত্যক্ষ

প্রমাণ। বৎসের সাহায্যে যে নৃশংসভাবে লোকে দুগ্ধ দোহন করে, তদপেক্ষা ঐ বৎসের প্রাণ হত্যা করাও উত্তম মনে হয়। ঐ নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা অনেকেই তোমরা সচরাচর দেখিয়া আসিতেছ। মনে কর, মানুষের কোন শিশু মায়ের কোলে বসিয়া তাহার মাতৃস্তন্য পান করিতেছে, এমন সময় অন্য কেহ আসিয়া ঐ শিশুকে তাহার মায়ের কোল হইতে জোরপূর্ব্বক লইয়া গিয়া মায়ের সমস্ত দুগ্ধটুকু দোহন করিয়া লইয়া গেল, আর ঐ শিশু মায়ের স্তন্যাভাবে ক্রন্দন করিয়া দিনদিন জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপ কোন ঘটনা লোক সমাজে ঘটিলে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার কোনই প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া তোমরা নীরব থাকিতে পারিতে কি? কিন্তু ঐ পরাধীন পশুজাতি মানুষের সঙ্গে বল-বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া কিছুতেই জয়ী হইতে পারিবে না, তাই ঐরূপ নৃশংস ব্যাপারও নীরবে সহ্য করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকাগণ কত কায়ক্লেশে বহুদূরদূরান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া মধু সংগ্রহ করিয়া আনে। কিন্তু দস্যুগণ ঐ মক্ষিকাগুলিকে অগ্নিদ্বারা বিতাড়িত করিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত সেই মধু অপহরণ করে। এই সকল নিষ্ঠুরতার কার্য্যই কি সত্ত্বগুণের পরিচায়ক? অতএব নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, জীবের প্রতি পদক্ষেপে অসংখ্য কীট ধ্বংস হইতেছে। পানীয় জলের সঙ্গে এবং শ্বাস বায়ুর সঙ্গে কত লক্ষ লক্ষ জীবাণু অহঃরহ উদরস্থ হইতেছে। এইজন্যই বৈষ্ণবদের প্রধান শাস্ত্র ভাগবতে লিখিত আছে—

জীবো জীবস্য জীবনম্।

অর্থাৎ—"জীবই জীবের জীবন।" একজীব অন্য জীবকে আহার না করিয়া কিছুতেই বাঁচিতে পারে না— ইহাই স্বতঃসিদ্ধ শাস্ত্রবাক্য। অসংখ্য কীটাণু দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আবার স্বাভাবিক ক্রমেই যথা সময়ে তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু সঙ্ঘটিত হইতেছে।

যে খাদ্য খাইলে কোন জীব হত্যা হয় না, এইরূপ খাদ্যকেই লোকে নিরামিষ আহার বলিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবহত্যা ব্যতীত যে এই জগতে আমিষ কি নিরামিষ কোন প্রকারের খাদ্যই হইতে পারে না, তাহা

নিরামিষভোজিগণ কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। কাজেই কেবলমাত্র কর্ত্তৃত্বাভিমানী, অজ্ঞান মানবগণ সেই জীব হত্যার পাপ ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত হয়। এই স্থূল দেহ ও আত্মার পৃথকত্ব বোধ না থাকায় অর্থাৎ এই দেহই আমি, অতএব দেহধ্বংসেই আমার ধ্বংস হইবে এইরূপ মিথ্যা জ্ঞান থাকায়, অজ্ঞগণ নিজ মৃত্যু ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত থাকে এবং সেই ভয়ই তাহাদের মনকে সর্ব্বদা সন্তপ্ত করে। জ্ঞানী পুরুষ এই সৃষ্টিকে মিথ্যামায়াময় জানিয়া নিজের কিংবা অন্যের মৃত্যুতে বিচলিত হন না।

দেহধারণের জন্য হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ এবং কারবন্ অথবা প্রোটিন্, ফেট্স, কার্ব্বহাইড্রেট ভাইটামিন্, এবং মিনারেলস্ এই কয়টি জিনিষের দরকার। উহা আমিষ ও নিরামিষ উভয়রূপ খাদ্যের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তাই প্রত্যেকের মন নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারেই মৎস্য-মাংস কিংবা শাক-সব্জী আদি খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অনেকে ঘৃতের গন্ধই সহ্য করিতে পারে না, কেহবা দুগ্ধ হজম করিতে অক্ষম, ইত্যাদিরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কাজেই ঐ সকল ঘৃত দুগ্ধাদি যে তাহাদের পক্ষে অখাদ্য বলিয়া গণ্য, তাহা তাহাদের ভিতর হইতে প্রকৃতি বা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন। ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছ যে, প্রকৃত রুচির বিরুদ্ধে কাহাকেও আমিষ কি নিরামিষ কোন খাদ্যই জোরপূর্ব্বক খাওয়াইতে চেষ্টা করা বা কেহ আমিষ ভক্ষণ করিতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করা, অথবা মাৎস্য-মাংসাদির উপর তাহার ঘৃণা জন্মাইবার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও মহাপাপের কার্য্য। অতএব দুগ্ধ, ঘৃতভোজীরা নিজ অজ্ঞতাবশতঃ মাংসভোজীদিগকে বৃথা হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় প্রকার খাদ্যের মধ্যে একই বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে,—রূপের প্রভেদ মাত্র।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে নব্য 'বৃকট' সম্প্রদায়ের উপদেশানুযায়ী যদি সকলেই নিরামিষ আহারী হইয়া যায়, তবে উত্তম ব্যবস্থাই হইবে। কারণ ঐ 'বৃকট' মতাবলম্বীদের কুসংস্কার এতদূর চরম সীমায় গিয়াছে যে, তাহারা মৎস্য আহার করা দূরে থাকুক, কোন মৎস্যাহারীকে স্পর্শও করিবে না। এমন

কি, প্রকাশ্য রাস্তায় চলা ফেরার সময় কোন মৎস্যাহারীকে দেখিলেই, উহারা মৎস্যাহার করে বলিয়া উহাদের উপর ঘৃণা, এবং উহারা তাহাদের শরীর স্পর্শ করিলেই তাহাদের দেহ অশুচি হইবে ভাবিয়া তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। তাই তাহাদিগকে স্পর্শ না করিয়া অতি সাবধানে পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়। পাঠকদিগের এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ঘৃণা ও ভয় এই দুইটি ভাব মনের নিকৃষ্ট তমোগুণের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং দেখা যায় যে, নিরামিষ ভক্ষণের ফলে ঐ বৃকটদিগের তমোগুণই অর্জ্জন হইয়া থাকে। গর্ভধারিণী জননী ও পিতা পূর্ব্বাপর মৎস্যাহার করেন বলিয়াই সেই মাতাপিতা কোনদিন নিরামিষাহার করিয়াও সেই ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ দিলে তাহা ঐ বৃকট মতাবলম্বী পুত্র গ্রহণ করিবে না ; এমনকি তাহাদের স্পৃষ্ট কোন বস্তুও সেই বৃকটগণ কিছুতেই ভোজন করিবে না। সুতরাং এই সকল নিরামিষাহারিগণ কখনই ছাগ, মেষাদি গৃহপালিত পশু পোষণ করিবে না, যেহেতু ঐ সকল পশু রক্ষা বা সংহার করা কোনটাই তাহাদের প্রয়োজনে আসে না। ঐ অরক্ষিত পশুগণ দিন দিন বংশ বৃদ্ধি পাইয়া কালে এইরূপাবস্থায় পরিণত হইবে যে, তখন সেই অসংখ্য পশুগণের হাত হইতে মানুষের খেতের ফসল রক্ষা করার জন্যই বাধ্য হইয়া ছাগাদি পশুগুলিকে অরণ্যাভিমুখে বিতাড়িত করিতে হইবে। অরণ্যে গিয়া বন্য হিংস্রজন্তুর আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া উহারা কি এইরূপ লোকালয় ও অরণ্য উভয় স্থান ত্যাগ করিয়া শুষ্ক মরুভূমিতে থাকিয়া উপবাসে দিন কাটাইবে ? কাজেই যদি ঐ সকল লক্ষ লক্ষ পশু লোকের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আক্রমণ করে, তবে তখন সেই নিরামিষভোজিগণের করুন হৃদয়েও তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হইয়া উহাদিগকে বধ করিতে বাধ্য হইবে। অথবা ঐ সকল তথাকথিত বৈষ্ণব ব্যক্তিরা দয়া পরবশ হইয়া সেই সকল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র ছাগাদি পশুদের হাতে প্রদান করিয়া সেই পুণ্যের ফলে এই ছার দেহত্যাগ করিয়া পুত্র পরিজনসহ স্বর্গে যাইবে অর্থাৎ অনাহারে মরিবে।

ঐ সকল 'বৃকট' মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ শাক পাতা খাইয়াও স্ত্রীসঙ্গ সুখভোগ করিতে কিছুতেই বিরত হয় না। আবার কোন কোন বৈষ্ণব ধ্বজভঙ্গ, শুক্র তারল্য ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গেলে, তিনি তখন 'হংসরাজ ঘৃত' অথবা 'ছাগলাদ্য ঘৃত' ইত্যাদি আমিষ হইতে তৈয়ারী ঔষধ খাওয়াইয়া রোগ মুক্ত করেন। এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অজ্ঞ বৈষ্ণবদের মনে কিছুতেই বিচার আসে না। বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদেশ উপদেশ ঐ বৃকটগণ মানে কি? সেই চৈতন্য চরিতামৃতেও বর্ণিত আছে—

অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অর্থাৎ—"অসৎ-সঙ্গ ত্যাগ করাই বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। কারণ একমাত্র অসৎ-সঙ্গই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকর। সেই অসতের মধ্যে দুইটি ভাগ করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গ সুখ ভোগ করে বা স্ত্রীসঙ্গ সুখ ভোগকারীর সঙ্গও করে, সে প্রধান অসাধু বা অসৎ এবং দ্বিতীয় অসাধু যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণের উপর ভক্তি নাই।" সুতরাং এখানে দেখা যাইতেছে যে, মৎস্য মাংসভোজী অপেক্ষাও স্ত্রীসঙ্গ সুখ ভোগকারীই প্রধান অসৎ বা অসাধু বলিয়া গণ্য। তারপর ঐরূপ অসাধু ব্যক্তির যে কি সাংঘাতিক অধঃপতন হইয়া থাকে তৎসম্বন্ধেও ভাগবতে বর্ণিত আছে—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীং শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমোদমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ—"সত্য, শৌচ, দয়া, সৎপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই পূর্ব্বোক্তরূপে অসৎসঙ্গবশতঃ মানবের ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" এই সকল প্রধান সংযমের দিকে কোনই লক্ষ্য না করিয়া বৈষ্ণবগণ কেবল সাধারণ মৎস্য মাংসাহার লইয়াই সমাজে

ঘোর অশান্তির সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। অথচ আজকাল তথাকথিত বৈষ্ণবগণ অনেকেই ঐ সকল শাস্ত্র বাক্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, নিজেদের রুচি অনুযায়ী পুরুষগণ গ্রামবাসী অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে 'কিশোরী-ভজন' ও 'গোপিনিগণের বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি নানাপ্রকারের কৃষ্ণলীলাকরতঃ কামিনী রসাস্বাদনে ডুবিয়া থাকে। ইহাই কি তাহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্ম ? পরমত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি তাহাদিগকে সমাজে এইরূপ ব্যভিচার সৃষ্টি করিয়া, ভোগবাসনানল জ্বালিয়া রিপু চরিতার্থ করিতেই বলিয়া গিয়াছেন ? অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানের তথাকথিত বৈষ্ণবগণ হিন্দুসমাজে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নানারকমে কলঙ্ক রটাইতেছেন।

আর্য্য জাতি ও তাহাদের আহার।

প্রাচীন আর্য্যগণ এই ভারতবর্ষে প্রথমে সিন্ধুনদের তীরে বাস করিতেন, সেই কারণেই তাঁহারা হিন্দু নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও আহারাদির জন্য তাঁহারা গো মহিষাদি বহু পশু হত্যা করিতেন। কাজেই বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রে গোমাংসাহারের বিধি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। সেই আর্য্য জাতির শাখাই নব্য ইউরোপ ও আমেরিকাবাসিগণ। তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বের সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম খাদ্য মাংসাহার এখনও তাহাদের সমাজে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে ঐ সকল মাংসভোজী পাশ্চাত্য জাতি শারীরিক বলে অসুরের ন্যায় শক্তিশালী ও বীর্য্যবান এবং মানসিক বলেও বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া

জল, বায়ু আদি পঞ্চভূতকে আয়ত্তে রাখিয়া জল, স্থল ও ব্যোম সর্ব্বত্রই গতাগতি করিতেছে। শব্দ, স্বর তালাদি সহ মানুষের কণ্ঠস্বরকে গ্রামোফনে বদ্ধ করিয়া লইয়াছে। বিদ্যুৎ শক্তিকে বশে রাখিয়া তদ্দ্বারা গাড়ী চালান এবং দূরবর্ত্তী বার্ত্তা আহরণ করা ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য্যোদ্ধার করাইয়া লইতেছে। ঐ সকল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ শিল্প বাণিজ্যাদিতে এবং সাম্রাজ্যবলেও সমৃদ্ধিশালী। তাহাদের রজঃ ও সত্ত্বগুণের শ্রেষ্ঠত্ব জন্মিয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐরূপ দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী হইতে পারিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া সাধনা দ্বারা একাগ্রতা লাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সকল কোন বিজ্ঞানই আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। বৈজ্ঞানিকদের ঐ যোগ সাধনের ফল সকল জাতিতেই ভোগ করিতেছে। ঐ সকল মাংসভোজী পাশ্চাত্য জাতি সেই প্রাচ্য শাস্ত্রসকল চর্চ্চা করিয়া শ্রুতি ভাষ্যাদি বৈদান্তিক গ্রন্থসকল নিজ দেশে প্রচলিত করিতেছে। সেই আদিম কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কেবল ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ধর্ম্ম প্রচারক ও ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ভূতত্ত্ববিদ্ এবং চিকিৎসক প্রভৃতি বিজ্ঞব্যক্তিগণ সকলেই মাংসভোজী ছিলেন ও আছেন। তাঁহারা কেহই নিরামিষ আহারকে সর্ব্বসাধারণের জন্য উচ্চাসন দেন নাই এবং নিরামিষ ভোজীদের মধ্যেও কেহই ঐ সকল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। এই ভারতে বিজ্ঞানাদি বিষয়ে যদি কিছু আবিষ্কার হইয়া থাকে, তবে তাহাও আমিষভোজীর মস্তিষ্ক দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। পরলোকগত জগদীশ চন্দ্র বসু ও মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণ আমিষ ভোজনই করিতেন। আর, আমিষ আহার ত্যাগী হিন্দুগণ পুরুষানুক্রমে কেবল বার্ত্তাকু (বেগুন) ভক্ষণের ফলে এই জগতে তাহারা শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা ও বিজ্ঞানাদি বিহীন হইয়া পর-পদলেহী দাসরূপে পরিণত হইয়াছে। সেই বার্ত্তাকু ভক্ষকদের পূর্ণ

যৌবনাবস্থায়ও দেহ এবং ইন্দ্রিয়সকল জীর্ণশীর্ণ হইয়া মস্তিষ্ক কর্দ্দমের ন্যায় হইয়া যাওয়ায়, সনাতন ধর্ম্ম গ্রন্থ বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের সুগভীর তত্ত্ব মস্তকে প্রবেশ করিতেছে না। এমনকি সেই বৈদিক সংস্কৃত ভাষাও পশুর ভাষার ন্যায় অবোধ্য হইয়া পড়ায়, বেদাধ্যায়িগণ মাত্র ভাষ্য ও অনুবাদাদির সাহায্য গ্রহণে বেদ পাঠ করিয়া থাকে। ঐ সকল সাহায্য গ্রহণ সত্ত্বেও চারি বেদাধ্যায়নকারী ব্যক্তি পাওয়া অতি দুষ্কর। এই সকল সেই আদিম আর্য্য ঋষিদের বংশধরগণ তাঁহাদের মাংসাহার ত্যাগ করিয়া কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিতে করিতে কুষ্মাণ্ডে পরিণত হইয়াছে! যদি ইহারা গোরস বলিয়া ঘৃত, দধি ও দুগ্ধাদি আহার করা ত্যাগ করিত, তবে যে এতদিনে উহাদের মস্তিষ্কের কি অবস্থা হইয়া যাইত, তাহা ধারণাতীত। নিরামিষ ভোজনের ফলে অধিকাংশেই কি ভাবে যে বিদেশীয় আমিষ ভক্ষণ করিয়া নৈষ্টিকতা বহাল রাখে তাহার একটী দৃষ্টান্ত মনে পড়িল:—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বিশেষতঃ বৃকট মতাবলম্বী একব্যক্তি বিষমজ্বর ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছে। সেই রোগীকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া দেখা গেল যে, রোগীর শরীরে আমিষ অর্থাৎ মৎস্য-মাংস-রসকর বলবর্দ্ধক আহার্য্য রসের অভাব হওয়াই এই ব্যাধির মূল কারণ; সুতরাং রোগীকে আমিষ ভোজন করাইতেই হইবে নতুবা জীবন রক্ষা পাইবে না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও বিষমজ্বরের রোগীর জন্য 'গোমাংসের যূষ' ব্যবস্থা করিয়াছেন। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গোঁসাই, বিশেষতঃ বৃকট মতাবলম্বী নিরামিষভোজী রোগী, 'কাটা' বা 'রক্ত' শব্দ মুখে উচ্চারিত হইলেই যাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়, সেই ব্যক্তিকে এখন শ্রীধাম নবদ্বীপে বসিয়া প্রকাশ্যে মৎস-মাংসাদি আমিষ ভোজন করাইয়া জীবন রক্ষার জন্য তাহার জাতি ও ধর্ম্ম নষ্ট করা যায় কি প্রকারে? এই রোগী জীবন গেলেও কিছুতেই আমিষ ভক্ষণ করিবে না। অথচ যে প্রকারেই হউক উহাকে আরোগ্য করিতেই হইবে, ইত্যাদিরূপে রোগীর নিরামিষভোজী আত্মীয়গণ পরামর্শ স্থির করিল। ইহা দেখিয়া ডাক্তার বাবু তখন ঐ

কুসংস্কারাচ্ছন্ন আত্মীয়গণের অভিরুচিমতেই রোগীর জন্য দেশীয় আমিষ না দিয়া নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং বিলাতের গোরু ও মুরগীর রস হইতে মিঃ ব্রেণ্ড সাহেবের তৈয়ারী 'ব্রেণ্ডস্ এসেন্স' এবং বেঞ্জার কোম্পানীর গোমাংস হইতে তৈয়ারী 'বিফ জেলী', 'বিফ যুস্' 'চিকেন্ জেলী' এবং কড্ মৎস্য হইতে মিঃ ডিজন্ সাহেরের তৈয়ারী 'ডিজন্স কড্ লিভার অয়েল' ইত্যাদি নামীয় নানাপ্রকার বিদেশীয় আমিষ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'দোকান হইতে এই কয়েকটী ঔষধ ক্রয় করিয়া আনিয়া রোগীকে অবিলম্বে সেবন করাইবার ব্যবস্থা করুন, নতুবা জীবনের আশা কম'। মূর্খ আত্মিয়গণও তখন তাহাই করিল। ঐ সকল ঔষধ সেবনে রোগীও অবিলম্বেই আরোগ্য লাভ করিল। এইরূপ 'বিফ জেলী' 'চিকেন্ জেলী', 'বভ্রিল্', 'বিফ যূষ' এবং 'চিকেন্ যূষ' ইত্যাদি নামীয় বিলাতি ঔষধ খাইয়া অসংখ্য নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হিন্দু রোগী দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আসিতেছে। এই সকল ঔষধের দ্বারা বিলাতী গোরু, ঘোড়া,মহিষ, মুরগী ইত্যাদি পশু পক্ষীর রক্ত যে কি পরিমাণে আমাদের ভারতবাসী হিন্দুদের উদরস্থ হইয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে ভারতীয় ডাক্তারখানাগুলি হইতে তাহার রিপোর্ট গ্রহণ করিলেই এই উক্তির সত্যতা আরও বিশিষ্টরূপেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে। ইহা জানিয়া বুঝিয়া ভারতবাসী হিন্দুগণ রুগ্নাবস্থায়ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাদেশানুযায়ী স্বদেশী মহিষ, ঘোড়া, শূকর ও মুরগার বা কবুতরের টাটকা যূষ নিজ বাড়ীতে তৈয়ার করিয়া খাইতে স্বীকৃত হন না। বিলাতি সাহেবদের তৈয়ারী যে কোনও যূষ বোতল ভরা হইলেই তাহা নৈষ্ঠিক হিন্দুদের পবিত্র বলিয়া বোধ হয়।

হে হিন্দু বন্ধুগণ! এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে, যদি পূর্ব্ব হইতেই ঐ রোগী শাস্ত্রানুযায়ী দেশীয় মৎস্য মংসাদি খাইয়া নিজের স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিত, তবে হয়ত আজ তাহাকে এই ব্যাধি-গ্রস্ত হইতে হইত না. এবং এই রুগ্নাবস্থায়ও যদি তাহার কুসংস্কার দূরে করিয়া

স্বদেশীয় মৎস্য-মাংসাহার করিতে স্বীকৃত হইত, তবে আর ঐ ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশীয়দের তৈয়ারী গোরু, মুরগী ও মৎস্যাদির রস খাইয়া আজ তাহাকে এই নৈষ্ঠিকতা বহাল রাখিতে হইত না বরং ঐ সকল বিলাতী ঔষধের মূল্যের পয়সাগুলি এই দেশেই থাকিয়া গিয়া, গরীব ভাইদের উপকার হইত এবং বিলাতী গোমাংসরসের ঔষধের মূল্যাপেক্ষা যথেষ্ট কম মূল্যেই স্বদেশী পাঁঠা কি কবুতর ও মাগুর মৎস্যের রসের ব্যবস্থা হইত। বিদেশবাসীদের নিকট আমাদের এইরূপ মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কুসংস্কারের দোষে বিলাতী গোরু, ঘোড়া ও মুরগী ইত্যাদির মাংসাহার করিয়া আমরা হিন্দুধর্ম্মের নৈষ্ঠিকতা রক্ষা করিয়া থাকি। এইরূপ বিচারহীন পশুর ন্যায় কার্য্য করি বলিয়াই বিদেশবাসীরাও আমাদিগকে পশুর ন্যায়ই দেখিয়া থাকে। নিরামিষভোজী সংস্কৃত বিদ্যার্থীদের অনেকেই যে বিলাতী 'ডিজন্স কড্ লিভার অয়েল' সেবন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহা আমি স্বচক্ষেই বহুস্থানে দেখিয়াছি।

আনন্দের বিষয় এই যে বর্ত্তমানে ভারতেই কলিকাতা, বোম্বে, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে গরু, ঘোড়া মহিষাদির রক্ত হইতে নানাপ্রকারের শক্তিবর্দ্ধক ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই ঐ জাতীয় শক্তিবর্দ্ধক ঔষধের জন্য এখন আর আমাদিগকে বিদেশে যাইতে হইবে না বলিয়া আশা করা যায়। ওহে অবিবেকী নৈষ্ঠিক হিন্দু ভ্রাতাগণ! আর অধোবদনে না থাকিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া তোমাদের শাস্ত্রের সঙ্গে তোমাদের আহার, বিহার ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করিয়া, মনের কুসংস্কার দূরকরতঃ এখনও পুনরুত্থানের চেষ্টা কর। একবার চিন্তা করিয়া দেখ, সংস্কারান্ধ হিন্দুগণ বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিয়াও তাহাদের চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী পুত্র জন্মে না কেন? বার্ত্তাকুর শক্তিতেই যদি চতুর্ব্বেদী পুত্র জন্মিতে পারিত, তবে সেই আর্য্য ঋষিদের বংশধরগণই আমরা ঐ বার্ত্তাকু খাইতে খাইতে ভীরু, মূঢ় ও অজ্ঞ মূর্খ হইয়া বংশপরম্পরা সকল বিষয়ে দিন দিন অধঃপাতে যাইতাম না। অসার

বস্তু আহার করিলে মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত দেহই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষীণাঙ্গ, দুর্ব্বল ব্যক্তি দ্বারা ভোগ, যোগ কিংবা বিজ্ঞানাবিষ্কার কিছুই হইতে পারে না। কাজেই তাহার জন্ম বিফল। অতএব এই সকল আধুনিক কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া যদি একবার যুক্তি দ্বারা ন্যায় বিচার করিয়া দেখ, তবে সেই ঋষিদের বেদ, বেদান্ত তন্ত্র ও পুরাণোক্ত মাংসাহার বিষয়ে আর ভ্রম থাকিবে না। হিন্দু সমাজের সর্ব্বত্র যাহাতে এই কুসংস্কার বিদূরীত হয়, হিন্দু মাত্রেই তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; নতুবা কিছুতেই দেশের ও দশের মঙ্গল সাধিত হইবে না।

আর্য্য ঋষিদের অনুসরণ কর।

অনেকেই গল্প বলিয়া থাকে যে 'ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সেই আর্য্যগণ খুব তেজস্বী, বলবান, মেধাবী এবং শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। আজকাল তাঁহাদেরই বংশধর আমরা বংশপরম্পরা জন্মগ্রহণ করিয়া এখন ক্ষীণাঙ্গ, ভীরু, দুর্ব্বল, মেধাশক্তিশূন্য ও শৌর্য্যবীর্য্যহীন হইয়া কাপুরুষতা লাভ করিয়া আসিতেছি ইত্যাদি। জনশ্রুতি শুনা যায় যে, ক্রমে এমন দিন আসিবে যখন বেগুন-গাছতলায় হাট বসিবে। অর্থাৎ লোক আরও এত খর্ব্বাকৃত হইয়া যাইবে যে, তখন ঐ বেগুন গাছের নীচে দিয়াই অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিবে'। আমাদের অবস্থাদৃষ্টে ঐ জনশ্রুতি অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারতের এই অধঃপতনের কারণ প্রধানতঃ পুষ্টিকর ও তেজস্কর আহার না করা। অতএব যদি সেই আর্য্য মুনিঋষিদের ন্যায় তেজোবীর্য্যবান ও মেধাশালী

হইতে চাও, তবে ঠিক তাঁহাদের আহার্য্যের ন্যায় বর্দ্ধনশক্তিবিশিষ্ট ও বীর্য্যবর্দ্ধক এবং বলকারক নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর মাংস ও মৎস্যাদি আহার কর। 'আহারের দ্বারাই শরীরের উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে', ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের বাণী ও সর্ব্ববাদী সম্মত। কাজেই যে আহারের গুণে মুনিঋষিগণ তেজস্বী ও শক্তিশালী হইতেন, তোমরাও সেরূপ আহার না করিলে কিছুতেই তাঁহাদের স্থান অধিকার করিতে পরিবে না।

বর্ত্তমান যুগে পুষ্টিকর ও তেজস্কর আহার্য্যের মধ্যে দুগ্ধ, ঘৃত ব্যতীত আরও বীর্য্য ও ওজঃবর্দ্ধক শক্তিশালী মৎস্য-মাংসাদির কথা শুনিলে, অনেকেরই শরীর শিহরিয়া উঠে। মনে কর, তোমরা যাঁহাকে আদর্শ পুরুষ মনে করিয়াছ, তোমাদিগকে তাঁহার মত হইতে হইলে, খাদ্যাখাদ্যাদি সকল বিষয়েই তাঁহার আদেশ উপদেশ মানিয়া, তাঁহারই অনুসরণ করিয়া তোমাদিগকে চলিতে হইবে। কিন্তু যদি ঠিক সে ভাবে না চলিয়া তোমাদের নিজ মতানুযায়ী চলিতে থাক, তবে অনন্তকালেও তোমরা তাঁহার মত হইতে পারিবে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ঠিক সেইরূপ বেদ, বেদান্ত ও আয়ুর্ব্বেদই আমাদের হিন্দুজাতির মূল ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রবেত্তা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদেরই বংশধর আমরা। সেই ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ জানিতেন যে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার আহার্য্যই মানব শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাই তাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্রাদেশানুযায়ী যেমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাংস আহার করিতেন, তেমনি পুষ্টিকর নানা প্রকার ফলমূলাদিও প্রচুর পরিমাণেই আহার করিতেন। এ কারণেই তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক শক্তিতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে রাশিয়া, জার্ম্মানি ও আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশবাসিগণই আমাদের ঐ সকল শাস্ত্রের গৌরব রক্ষা করিয়া পরিমিতরূপে মৎস্য মাংস ও পুষ্টিকর নানাপ্রকার উত্তম ফলমূলাদি ভোজন করিয়া আসিতেছে এবং তদনুযায়ী তাহারা উত্তম ফল লাভ করিয়া স্বাস্থ্যবান ও মেধাশীল হইয়া সুকঠিন বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইতেছে। আর আমরা

ভারতবাসী হিন্দুগণ, ঐ অমূল্য গ্রন্থসকলের ও পূর্ব্বপুরুষগণের হিতোপদেশ বাক্য অবমাননা করিয়া মিথ্যা ধর্ম্মের ভাণকরতঃ মৎস্য মাংসাহার ত্যাগ করিয়া, আমাদের নিজ নিজ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের দোষে কেবলমাত্র কতকগুলি শাক-সব্জী ভোজনের ফলে বংশপরম্পরা ক্ষীণাঙ্গ ও দুর্ব্বল হইয়া দিন দিন রসাতলে যাইতেছি। তাই আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। কাজেই কি প্রকারে আমরা সেই ঋষিদের স্থানের অধিকারী হইবে?

বর্ত্তমান যুগে কতকগুলি কুসংস্কারান্ধ, অবিচারী লোক, অসঙ্গত কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করিয়া মৎস্য মাংসাদিকে মানব জাতির অখাদ্যাহার বলিয়া প্রতিপন্ন করাইবার প্রয়াস পাইতেছে। অথচ তাহারা শাস্ত্রাদি আলোচনা এবং অতীত ও বর্ত্তমান মানব জগতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও দেখিয়া আসিতেছে যে, তাহাদের বর্ণিত যাহা মানুষের অখাদ্য মৎস্য-মাংসাদি তাহা ভক্ষণ করিয়াই পূর্ব্বের মুনিঋষিগণ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া স্বগর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্তও মানব সমাজের সেই আমিষ-ভোজিগণই জ্ঞান-বিজ্ঞানে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, শৌর্য্য-বীর্য্যে ধন-রত্নে, ব্যবসা বাণিজ্যে এবং সাম্রাজ্য শাসন-সংরক্ষণাদি সর্ব্বকার্য্যেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে। মাটি, পাথর ও কাষ্ঠাদি বস্তু মানুষের অখাদ্য এবং মাংস-মৎস্যাদি গোরু, ছাগল, মহিষাদির অখাদ্য। ঐ সকল অখাদ্য আহার করিয়া উহারা কেহই বাঁচিতে পারে না। সুতরাং ঐ মৎস মাংসাদি যদি মানুষের অখাদ্যই হইবে, তবে তাহা ভোজন করিয়া লোক সমাজে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা দূরে থাকুক, জীবনেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন না।

অতএব হে ভারতবাসী হিন্দু ভ্রাতাগণ! তোমাদের সেই শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণু অবতারগণ এবং আর্য্য ঋষিগণ নিজেরা নানাপ্রকার আমিষ ভোজন করিয়া গিয়াছেন এবং তোমাদিগকেও সেই আমিষ ভোজনের আদেশ দিয়া গিয়াছেন। কাজেই সেই সকল অবতার ও ঋষিদের

নাম দিয়া, যে সকল কুসংস্কারান্ধ নব্য ধর্ম্মধ্বজিগণ, 'অমুক উবাচ, অমুক উবাচ' বলিয়া মিথ্যা গ্রন্থসকল ছাপাইয়া নিজ নিজ মতানুযায়ী মাংসাদি আমিষ আহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করিতেছে, তাহাদের ঐ মিথ্যা বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, প্রত্যেকের নিজ নিজ মনের ও শরীরের রুচি অনুযায়ী আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার আহারই গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা শরীরে ও মনে শান্তি স্থাপন কর, তবেই ক্রমে সমাজের ও দেশের উন্নতি করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিবে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব প্রভৃতি হিন্দুদের অবতারগণও মাংসাশী ছিলেন বলিয়াই শারীরিক শক্তিতে ও বুদ্ধিবলে বড় বড় যুদ্ধে জয় করিতে পারিয়াছিলেন, অসার শাক-পাতা লাউ, বেগুন খাইয়া তাঁহারা পৃথিবী জয় করিতে পারেন নাই। তখনকার দিনে প্রচুর আমিষ ভোজনেও ধর্ম্মহানি হইত না, এখনও হইবে না। এই কথা সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য।

গোবধ নিবারণের কারণ।

সভ্যাসভ্য যত প্রকারের মানুষ আছে তাহাদের মধ্যে, অসভ্য জাতিরা বন্য পশু ও ফলমূলাদি খায় এবং সুসভ্য সমাজে বন্য ও গ্রাম্য পশু এবং শস্যাদি আহার করে। শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রমতে পূর্ব্বে গবাদি সর্ব্বপ্রকারের পশুই খাদ্য ছিল। এই কারণে তখন অসংখ্য গোবধ হইত। ক্রমে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের অভাব হওয়ায়, তখন কৃষি বানিজ্যাদি ও গোদুগ্ধের জন্য গরু ঘোড়াদি নানা প্রকার পশুর প্রয়োজন হয়। কাজেই গোমাংসাহারের জন্য অসংখ্য গরু কমিয়া যাওয়ায় পরে ঐ সকল কার্য্যের জন্য গোরক্ষার প্রয়োজন হওয়ায়, গোবধ নিবারণের

৫

চেষ্টা করা হয়। সমাজস্থাপকগণ যখন দেখিলেন যে, সুস্বাদু গোমাংসাহার করা হিন্দুগণ কিছুতেই ত্যাগ করিতেছে না, তখন তাহারা গরুর ছবি আঁকিয়া সেই গরুর ছবির গায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং ভগবতী প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, 'গোবধ করিলে ঐ সকল দেব-দেবীবধের পাপে নরকে গমন হইবে' ইত্যাদিরূপে সর্ব্বসাধারণের মনে নরকের ভয় প্রদর্শন করাইয়া বহু কষ্টে হিন্দুদিগের গোবধ নিবারণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, গোবধ না করিয়াও অন্যান্য এমন বহুপশু-পক্ষী রহিয়াছে যাহাদের মাংসাহার দ্বারা শরীরের প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধ হইতে পারে।

দেখ, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি বিদেশীরা গোমাংসাহার করিয়াও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে উপযুক্ত খাদ্যাদি দ্বারা গোসেবা করিয়া, তাহার ফলে হস্তীর ন্যায় বৃষ ও দুগ্ধবতী গাভী অসংখ্য লাভ করিতেছে; আর ভারতবর্ষের গাভীসকল ক্ষীণাঙ্গী ও দুগ্ধহীনা। তাহার বৎস-বৃষগণও সেইরূপই জীর্ণশীর্ণ দেহবিশিষ্ট। ইহার একমাত্র কারণ, ভারতের হিন্দুগণ গরুকে উপযুক্ত আহার্য্য দিয়া সেবা না করিয়া, কেবল মাতৃ সম্বোধনপূর্ব্বক সিন্দুরাদি লেপন করিয়া ফুলবিল্বপত্র গরুর পায়ে দিয়া কোটি কোটি নমস্কারকরতঃ গরুর পূজা করিয়া থাকে। কাজেই তৎপরিবর্ত্তে গোসেবার ফলও ঠিক সেইরূপই পাইয়া আসিতেছে। বাংলাদেশে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে. 'হিন্দুগণ গোপালন বা গোসেবা করে না' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, মুসলমানগণই গোসেবা করিয়া থাকে। অথচ হিন্দুগণ কেবল মুখে মুখেই 'গোসেবা, গোসেবা' বলিয়া চীৎকার করে,—ইহার কোনই সার্থকতা নাই। অতএব গাভী ও বৃষগণ দুগ্ধাদি বিষয়ে যাহাতে আমাদিগকে সুফল দান করিতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া হিন্দুদের ঐ মৌখিক চীৎকার কার্য্যে পরিণত করা একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান ভারতের হিন্দুদিগের স্বাস্থ্য, জঠরাগ্নি ও দুগ্ধাভাব এবং সমাজ সামাজিকতা ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার দিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে

দেখা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত পীনস, বিষমজ্বর ও দেহের মাংসক্ষয় ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করার জন্যই একমাত্র গোমাংস দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক, ইহা ভিন্ন নিত্য-নৈমিত্তিক খাদ্যের জন্য গোবধ করা সঙ্গত নয়।

বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও ভূতত্ত্ববিদের মতামত।

উইলিয়েমস্, মেট্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি বিদেশী কতিপয় নব্য নিরামিষাহারিগণ দুগ্ধ, মৎস্য ও ডিম্বাদিকে নিরামিষে গণ্য করিয়া ভোজন করিতেন। গ্রেহাম ও এনা কিংস্‌ফোর্ড প্রভৃতি মুখ্য নিরামিষিগণ, মাংসাপেক্ষা শাক-সব্জী, ফলমূলাদি শস্যসকল সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আবার উক্ত ভ্রান্ত মতসকল খণ্ডন করিয়া ভিষক মাইল্‌স্, ডেনস্মোর আদি অন্য নিরামিষিগণ বলিয়াছেন যে, 'শস্যাদি অপেক্ষা কাঁচা মৎস্য-মাংসে সারাংশ যদিও অধিক না থাকুক, কিন্তু ঐ আমিষ খাদ্য পাক করা হইলে তাহাতে ঐ নিরামিষ শস্যাদি অপেক্ষা প্রোটিন বহু অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; আর শস্যাদির কাঁচা অবস্থায় প্রোটিন বেশী থাকিলেও, পক্ক অবস্থায় প্রোটিন বহু কমিয়া যায়'। এখানে পক্কাপক্ক ভেদে গুণের বহু তারতম্য দেখা যাইতেছে। হাক্‌স্লী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার আহারই মানুষের পক্ষে প্রয়োজন। ইভান্স, গব্লার, এস রো, বোথাম্ আদি বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে নিঃসন্দেহরূপে স্থির করিয়াছেন যে, শাক-শস্যাদির মধ্যে ভৌমিক পদার্থ বেশী থাকায় এই সকল ভোজ্য দ্বারা লোকের অকাল

বার্দ্ধক্য জন্মিতেছে। খ্যাতনামা ভিষক রেমও পাশ্চাত্য জাতির অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের মঠ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন যে, নিরামিষভোজী সাধু-সন্ন্যাসিগণ অতি অল্প বয়সেই জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ক্রীল্ নামক জনৈক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে 'হিন্দুজাতিগণ শাক-শস্যাদি নিরামিষ আহার করিয়া অকাল বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হইতেছেন'। উইন্‌ক্লার নামক জনৈক সুবিখ্যাত চিকিৎসক নিজেই নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, 'নিরামিষাহারের ফলে আমার দেহে অকাল বার্দ্ধক্য আসিয়াছে'। মার্কিন দেশীয় খ্যাতনামা চিকিৎসক মিঃ সেলিস্ বেরী বলিয়া গিয়াছেন যে 'আমি কেবলমাত্র মাংস ও গরম জল দ্বারা অসংখ্য রোগীকে সদ্য ফল দেখাইয়া দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত করিয়া আসিতেছি'। সুবিজ্ঞ ডাক্তার মিঃ ডিক্রুজ বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পরে বলিয়াছেন যে 'মানবের পক্ষে মাংস ও ঘৃতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। এমনকি, উত্তমরূপে পাক করিতে পারিলে মৃত পশুর মাংসও অখাদ্য হয় না' বোমণ্ট, পার্ক ও হাচিসন্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে "দেহরক্ষার উপযুক্ত প্রধান উপাদান 'প্রোটিন' উদ্ভিদের মধ্যে খুব সামান্য পরিমাণেই আছে। কিন্তু মৎস্য ও মাংসে উহা অধিক পরিমাণে দেখা যায়, কাজেই মানুষের আমিষ ভোজন করা একান্ত কর্ত্তব্য।" কিউভিয়ার ও এলফিজিয়ার আদি জন্তুতত্ত্ববিদগণ মিঃ ডারুইনের ন্যায় মানব জাতির আদি নিরূপণ করিতে যাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, 'মানবসকল কপি-বংশধর, অথবা কপি (বানর) ও মানুষ এই উভয় জন্তুর আদি পুরুষ এক জন্তুই ছিল। এই উক্তির গৌরব রক্ষা করিয়াই অনেকে বলে যে, ফলমূলাদিই মানবের স্বাভাবিক খাদ্য। কিন্তু উক্ত মিঃ এলফিজিয়ার ইহাও দেখাইয়া গিয়াছেন যে, বন্য কপিগণ ক্ষুদ্র পক্ষী, ডিম্ব ও কীট পতঙ্গাদি খাইয়া থাকে। আমরাও দেখিতে পাই যে, সকল শ্রেণীর বানরগণই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কীট-পতঙ্গ এবং ছোট পাখীর ডিম্ব্যাদি আমিষ ভোজন করে কিন্তু মানুষের মত উহাদের কোন অস্ত্র-শস্ত্র বা শক্তি নাই বলিয়াই

অন্য পশুকে হত্যা করিতে পারে না। সেইরূপ সুবিধা থাকিলে বোধ হয় বানরগণ বড় জীবকেও বধ করিয়া আহার করিত।

মিঃ লায়েল, ডুমণ্ট, পেটি, প্রেষ্টুইচ, রিবেরো, ফরেল, ইভান্স, পেঙ্গেলী, লুবক্, বুচার, ডিপারথিস্ ও পীট্ ডকিন্স আদি এই সকল বিখ্যাত অদ্বিতীয় ভূতত্ত্ববিদগণ বহু গবেষণা করিয়া বহু পূর্ব্বে সেই আদি মানব জাতিকে সর্ব্বনিম্নে যে স্তরে পাইয়াছেন, তাহাতে দেখিয়াছেন যে, বহু মৃত্তিকার নীচে মানুষের অস্থি, তাহার নিকটেই পশুর কঙ্কাল এবং ঐ পশু বধ করিবার উপযোগী প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র রহিয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সেই পুরাকালে প্রস্তরের দ্বারাই অস্ত্র নির্ম্মিত করিয়া পশু বধকরতঃ মাংসাহার করিত। সেই পশুর কঙ্কালের মধ্যে অস্ত্রচিহ্ন ও অগ্নি চিহ্ন দেখা গিয়াছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, উহাই সেই মানবের ভোজনাবশিষ্টাংশ পশুর অস্থিগুলি মাত্র রহিয়াছে। শিবালিক গিরি ও ডাক্তার ফ্যালকোণার এই ভারতবর্ষেও মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভে অবিকল ঐরূপই নরাস্থি ও পশুর অস্থি এবং প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র পাইয়াছিলেন। লৌহাদি ধাতু দ্বারা যে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব মানবগণ অনভিজ্ঞ ছিল বলিয়াই পাথর দ্বারা অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা পশু হনন করিত। ইহার প্রমাণ আরও বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে। অতএব সেই প্রাচীন জাতির চিহ্ন ভূগর্ভে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারাও ইহাই প্রামাণিত হইতেছে যে, আদিম কাল হইতেই আমিষ ভোজন লোক সমাজে প্রচলিত আছে।

বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় নব্য সুবিজ্ঞ ডাক্তারগণও বহু গবেষণা ও পরীক্ষান্তে বলিতেছেন যে, মানুষের আমাশয় ও অন্ত্রের গঠন কোন কোন অংশে মাংসাশী জন্তুর তুল্য হইলেও দৈর্ঘ্যে উহা হইতে অনেক বড়; অথচ তৃণভোজী প্রাণীদিগের পরিপাক অন্ত্র হইতে গঠনে বিভিন্ন এবং দৈর্ঘ্যে অনেক ছোট। অর্থাৎ মাংসাশী ও তৃণভোজী এই উভয় শ্রেণীর জন্তুর পরিপাক যন্ত্রের সঙ্গেই মানুষের পরিপাক যন্ত্রের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নাই বটে

কিন্তু যেটুকু আছে তাহাও মাংসাশী জন্তুর সঙ্গেই কোন কোন অংশে সামঞ্জস্য আছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং এই যুক্তিতেও ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই মানুষের রুচি অনুযায়ী দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইবে।

ইদানীং কোন কোন ভারতীয় ডাক্তারগণ বলিয়া থাকেন যে, 'আমিষ। ভোজিগণ অপেক্ষা নিরামিষাহারিগণ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে' রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের আমিষ ভোজী ব্যক্তিগণ পাঁচ হাজার, দশ হাজার, কি লক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বলিয়া যে সকল দীর্ঘায়ুর বর্ণনা দেখা যায়, এই কলিযুগের হিসাবে উহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত না হইলেও বর্ত্তমান যুগাপেক্ষা তৎকালীন ব্যক্তিগণ যে দীর্ঘকায় ছিলেন এবং সুস্থ সবলাবস্থায় দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রতি কোনই লক্ষ্য না করিয়া কেবল নিরামিষ ভোজন করিলেই দীর্ঘায়ু লাভ হইতে পারে না। আবার পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারগণ ইহাও বলেন যে 'মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করিতে মাংস ও ডিম্বের ন্যায় দ্বিতীয় কোন শক্তিশালী বস্তুই নাই'। আমাদের আয়ুর্ব্বেদও তাহাই বলেন। ঐ ডাক্তারবাবুগণের উক্তিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিরামিষ ভোজিগণ মাংস-ডিম্বাদি না খাওয়াতে তাহারা মস্তিষ্কের শক্তিহীন হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করার কোনই সার্থকতা নাই। মনে কর, একটা বটবৃক্ষ যদি লক্ষ বৎসরও বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার সেই বৃক্ষত্ব দূর হইয়া মনুষ্যত্ব জন্মিবে না। ঠিক সেইরূপ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব মানব। সে যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিতে মস্তিষ্ক শক্তিহীন হইয়া লক্ষ বর্ষও দেহ ধারণ করে, তবে সে সেই বৃক্ষের ন্যায়ই হইল। বৃথাই তাহার মানব জন্ম। বৃদ্ধাবস্থায় অকর্ম্মণ্য মস্তিষ্ক ও দেহ লইয়া বহু লোক যে ইহজগতেই অসহ্য নরক যন্ত্রনা ভোগ করিয়া সতত নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছে, এইরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর সকলেরই দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে।

সুতরাং অকর্ম্মণ্য দেহেন্দ্রিয় লইয়া সুদীর্ঘকাল জীবন ধারণকরতঃ নরক যন্ত্রনা ভোগ না করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদির পূর্ণ শক্তির বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তদপেক্ষা কিছু অল্পকাল জীবিত থাকা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। আচার্য্য শঙ্কর ৩২ বৎসর বয়সে এবং স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক মহাপুরুষগণ অতি অল্পকাল মধ্যেই জ্ঞানালোকে যে সকল কার্য্যোদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, বহু ব্যক্তি শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকিয়াও ঐ সকল মহাত্মার কার্য্যের সহস্র ভাগের একাংশও পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেছে না। অতএব মানবের কাম্যবস্তু বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান ও স্বাস্থ্য এবং ইহারই নামান্তর ধর্ম্ম। এই দুইটী একাধারে থাকিলেই তাঁহাকে ধার্ম্মিক কহে এবং তিনিই অপার স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিচারহীন, সংস্কারান্ধ কেবল নিরামিষ লাউ, বেগুন ভোজীর পক্ষে সেই স্বর্গ-সুখ লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সহজ প্রাপ্য মাংসাহার কর।

অনেকে বলিয়া থাকে যে মাংসাহারে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কারণ বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা বা কালীপূজোপলক্ষে দেবীর নিকট বলি দেওয়া ছাগ মহিষাদি পশুগণ মধ্যে মাত্র অজা ও মেষের মাংসই দেবীর ভক্তগণ ভোজন করিয়া মহিষের মাংস ফেলিয়া দেয়। অথচ একটী মহিষের মাংস দ্বারা বহু লোকের পরিতোষরূপে ভোজন হইতে পারে। ঐ পশুগণ সকলেই তৃণভোজী এবং একই দেবতার প্রসাদ। মাংসের গুণের তারতম্য করিতে গেলেও ছাগ এবং মেষের মাংসাপেক্ষা মহিষের মাংস গুণেও অনেক শ্রেষ্ঠ। আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন—

নাতিশীতগুরুস্নিগ্ধং মাংসমাজমদোষলম্ ।
শরীরধাতুসামান্যাদনভিষ্যন্দি বৃংহণম্ ॥
মাংসং মধুরশীতত্বাদ্ গুরুবৃংহণমাবিকম্ ॥ (চরক সংহিতা)

অর্থাৎ—"ছাগ মাংস অতিশয় শীতল, স্নিগ্ধ বা গুরু নহে এবং ইহা ত্রিদোষজনক নহে। মানব দেহের ধাতুসমূহের সহিত সমগুণ বলিয়া ইহা ক্লেদ উৎপাদন করে না এবং বলবর্দ্ধনকারী। আর মেষ মাংস মধুর ও শীতল গুণযুক্ত বলিয়া গুরুপাক এবং বলবর্দ্ধনকারী।"

স্নিগ্ধোষ্ণং মধুরং বৃষ্যং মাহিষং গুরুতর্পণম্ ।
দার্ঢ্যং বৃহত্ত্বমুৎসাহং স্বপ্নঞ্চ জনয়ত্যতি ॥ (চরক সংহিতা)

অর্থাৎ—"মহিষের মাংস স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য (বীর্য্যবর্দ্ধক), গুরু, তর্পন (তৃপ্তিকর), দেহের দৃঢ়তা ও বৃহত্বকারী (লম্বা করে), উৎসাহজনক এবং নিদ্রাকর।" কাজেই ঐ অজা ও মেষের মাংসাহার করিতে পারিলে, মহিষের মাংসে কি দোষ করিল? উহা ফেলিয়া দেওয়ার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই শূকর, শজারু প্রভৃতি সহজ প্রাপ্য বন্য পশুগুলিকে অনেকে বধ করিয়া উহাদের মাংসও ফেলিয়া দেয়। সেই আয়ুর্ব্বেদেই বর্ণিত আছে—

স্নেহনং বৃংহনং বৃষ্যং শ্রমঘ্নমনিলাপহম্ ।
বরাহপিশিতং বল্যং রোচনং স্বেদনং গুরু ॥(চরক সংহিতা)

অর্থাৎ—"বরাহ (শূকর) মাংস স্নিগ্ধকারক, বর্দ্ধনশক্তি বিশিষ্ট ও বীর্য্যবর্দ্ধক, শ্রমঘ্ন, বায়ুঘ্ন, বলকারক, রুচিজনক, স্বেদজনক ও গুরুপাক।"

শল্লকো মধুরাম্লশ্চ বিপাকে কটুকঃ স্মৃতঃ ।
বাতপিত্তকফঘ্নশ্চ শ্বাসকাসহরস্তথা ॥ (চরক সংহিতা)

অর্থাৎ—"সজারুর (সেজার) মাংস মধুরাম্ল, কটুবিপাক, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক এবং কাস ও শ্বাস নিবারক।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই সকল মাংসও উপাদেয় মাংসই বটে। তথাপি একমাত্র অজ্ঞগণের

কুসংস্কারবশতঃ সমাজে ঐ সকল মাংসাহার প্রচলিত না থাকায় সেই সকল উত্তম মাংসকেও ফেলিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন পাঁঠা ও কবুতর ইত্যাদি ক্ষুদ্র গৃহপালিত পশুপক্ষী পোষিলেই প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ২।১ দিন মাংসাহার চলিতে পারে।

গারো পাহাড়ের নিকট মৈমনসিংহ ও শ্রীহট্ট জেলায় যে সকল হিন্দুগণ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে শূদ্র, নাপিত, সাহা, তিলী ও নমঃশূদ্র প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিগণ এখনও শূকর, সজারু, মৃগ ইত্যাদি নানাপ্রকার পশু ও পক্ষীর মাংসাহার করিয়া থাকে। প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানীয় ব্রাহ্মণগণও নাকি ঐ সকল শূকরাদির মাংসাহার করিতেন বলিয়া তথাকার স্থানীয় জনশ্রুতিতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক ধনী ও শিক্ষিত যুবক ও প্রৌঢ়গণের মাংস ডিম্বাদি খাওয়ার তীব্রেচ্ছা থাকায় কুসংস্কারান্ধ সমাজের ভয়ে তাহারা ঢাকা, কলিকাতা, বোম্বে, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরে যাইয়া বড় বড় হোটেলে বসিয়া নিজ অভিরুচি অনুযায়ী গোপনে নানাপ্রকার মাংসাহার করিয়া দেহ পুষ্ট করে। বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এখন দেশের শিক্ষিতদের মধ্যে খাদ্যা-খাদ্য নিয়া সংস্কার অনেক মাত্রায় হ্রাস হইয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত হোটেলগুলিতে এখন ধনী বৈষ্ণব ও মাড়োয়ারী (জৈনদের) প্রভৃত লোক মাংসাহার করিয়া শরীরকে সবল রাখিতেছে। এরূপও দেখা যায়, অনেক বৈষ্ণব সমাজের ভয়ে বাড়ীতে মাংস খাইতে পারে না অথচ শরীর রক্ষার জন্য হোটেলগুলিতে আসিয়া মাংস খাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার সমাজে দাড়াইয়া নিরামিষ লাউ বেগুণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়া মিথ্যা বক্তৃতা দ্বারা অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া সমাজকে প্রতারণা করিতেছে। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানেও অনেক বৈষ্ণব, মারোয়ারী ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণ সমাজের চোখে ধুলী দিয়া গুপ্তভাবে মাংস ডিম্বাদি আহার করিতেছে। অর্থাভাবপ্রযুক্ত অনেকে সহরে যাইতে না পারিয়া গ্রামেই অতি সঙ্গোপনে ঐ সকল আহারের বন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু তাহাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই অকৃতকার্য্য হইয়া, ঐ মাংসাদির কথা মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে অতৃপ্ত বাসনানলে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কষ্ট পাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেনীর মধ্যেও দেখা যায় যে, অনেকে অতি গুপ্তভাবে মুরগী ও অন্যান্য মাংস ডিম্বাদি আহার করে। আমাদের আদিশাস্ত্র বেদ-বেদান্ত ও আয়ুর্ব্বেদাদি ত্যাগ করায় শাস্ত্রচ্যুতিঘটাতেই আজ মহিষ, শূকর ও মোরগাদি শাস্ত্রীয় খাদ্যদ্রব্যগুলিও পর্য্যন্ত চোরের ন্যায় অতি সঙ্গোপনে আহার করিতেছে এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা 'খাই না' এই বলিয়া অস্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ সত্য কথা স্বীকার করিলে আমাদের ব্রাহ্মণত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, এই হইল আমাদের অবিচারী হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম ও রীতি। আহারের জন্য যে জাতিকে এইরূপ চোর ও সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী সাজিতে হয়, সেই ভীরু, কাপুরুষ জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। তাই বলি, হে হিন্দু বন্ধুগণ! একবার দিব্যনেত্রে চাহিয়া দেখ যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোন জাতিই খাদ্য জিনিষ গুপ্তভাবে খায় না এবং খাইয়াও সংস্কারান্ধ সমাজের ভয়ে তোমাদের ন্যায় অস্বীকার করিয়া মিথ্যাবাদির পরিচয় দিয়া পাপগ্রস্ত হয় না। অপরদিকে যাহারা গুপ্তভাবে মাংসাহারে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া চিন্তা দ্বারা মনে মনে মাংসাহার করে, শাস্ত্রমতে তাহাদিগকে মিথ্যাচারী বা কপটাচারী বলে এবং সে নরকগামী হয়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা দেখ। অর্থাৎ কেহ বেশ্যা গমন করিলে যে পাপ হইবে, অন্য কেহ লোক-নিন্দার ভয়ে বেশ্যালয়ে না যাইয়া যদি সেই বেশ্যার মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া সে মনে মনে বেশ্যা গমন করে, তবে তাহার ততোধিক পাপের ফলে সে নরক-গামী হইবে, ইহাই শাস্ত্রবাক্য ও ধ্রুব সত্য। সুতরাং যে সমস্ত কুসংস্কারান্ধ মিথ্যা শাস্ত্রকারদের সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে মাংসাহার না করিয়া যাহাদিগকে অনর্থক মিথ্যাচারী বা কপটাচারী বলিয়া শাস্ত্রানুযায়ী পাপের ভাগী হইতে হয়, সেই সব কপটাচারীদের পাপের জন্য এই আমিষভোজনে আধুনিক নিষেধাজ্ঞা জারিকারক মিথ্যা শাস্ত্রকারদেরই নরক গমন হওয়া যুক্তিযুক্ত। একমাত্র মিথ্যা প্রচারের ফলেই আজ ভারতের এই দুর্দ্দশা।

মিতাহার।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেবল খাদ্য কেন, তৃণ লতা হইতে আরম্ভ করিয়া কামিনী, কাঞ্চন আদি যে কোনও বস্তু মানুষের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধনের জন্যই তাহাদের ভোগ্য বস্তু করিয়া ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ ও গীতা প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই ঐ সকল ভোগ্য বস্তু পরিমিত পরিমাণে ভোগ করার বিষয়ে পুনঃপুনঃ শাসনবাক্যও রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি ঐ সকল দ্রব্য ভোগ করিবার সময় মানব কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পরে। তাই ভোগকালে মানুষ বিচারহীন হইয়া ঐ সকল দ্রব্য অপরিমিত ভোগ করিয়া নিজেই নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে। পরে সেই ক্ষতির জন্য একমাত্র সেই ভোগ্য বস্তুর উপরেই অনর্থক দোষারোপ করিয়া নিজে নির্দ্দোষ সাজে, ইহাই অবিচারী মানুষের স্বভাব। তাহার প্রমাণ দেখ,—স্ত্রী সম্ভোগ করিতে যাইয়া অনেকেই অপরিমিত রমণ করার ফলে অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় হইয়া শুক্রতারল্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়, ক্রমে তাহা যক্ষ্মা ব্যাধিতে পরিণত হইতে পারে। পরে বলে যে, 'স্ত্রীসঙ্গ করা অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য'। অথচ বিবাহিতেরও পরিমিত স্ত্রীসঙ্গ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি শাস্ত্রে রহিয়াছে, তৎপ্রতি তাহারা কোনই লক্ষ্য করিতেছে না। কেহবা অপরিমিত মদ কিংবা ভাঙ্গ পান করিয়া অত্যন্ত নেশাভিভূত হইয়া মাত্‌লামি করে এবং পরে বলে যে, 'মদ ও ভাঙ্গ অত্যন্ত খারাপ জিনিজ'। ঐ সকল বস্তু পরিমিতরূপে গ্রহণ করিলে সকলেরই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকার সাধিত হয়। যাহার শরীরে যে বস্তু যে পরিমাণ সহ্য হয় তাহাই তাহার পক্ষে পরিমিত ভোগ এবং যাহার পাকস্থলীতে যে পরিমাণ দ্রব্য হজম হয়, তাহাই তাহার পক্ষে মিতাহার। কাজেই সমস্ত শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া লোভের বশে অমিতাহারের ফলে তোমরা কষ্ট পাইবে, এই দোষ

কাহার ? দোষ তোমাদের কি ভোগ্য বস্তুর ? সেই মদ, ভাঙ্গ ত আর তোমাদিগকে বলে নাই যে, 'আমাকে বেশী পরিমাণে ভোগ কর ? তোমাদের মনই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া হাতকে আদেশ করিয়া বেশী পরিমাণ দ্রব্য তুলিয়া মুখে দিয়াছে। অতএব, ইহা তোমাদের নিজ নিজ মনের দোষ নয় কি ? এই ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ যদি নিজের দোষ নিজে দেখিতে পাইত, তবে সর্ব্বত্রই সংসার সুখময় হইত।

কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, 'মাংস গুরুপাক বস্তু, অতএব তাহা হজম করা সুকঠিন' ইত্যাদি। এই কথারও কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। কারণ মনে কর, তোমার প্রত্যহ মাংসাহারের অভ্যাস নাই, বহুদিন পরে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে কোন উৎসবোপলক্ষে মাংস খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। মাংস খাইতে সুস্বাদু বোধ হওয়ায় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি প্রায় তিনপোয়া মাংসাহার করিলে। পূর্ব্ব হইতেই মাংসাহারে অনভ্যস্ত থাকায় তোমার পাকস্থলী দুর্ব্বল আছে, তাই আধপোয়া মাংস খাইলেই তাহা তোমার পাকস্থলীতে রীতিমত হজম হইয়া শরীরে সত্ত্বগুণের কার্য্য করিত। কিন্তু তুমি সেইদিকে কোনই লক্ষ্য না করিয়া, হয় ত ছয়মাস কি বৎসরান্তে একবার মাংস পাইয়া জিহ্বায় লোভরিপুর বশবর্ত্তী হইয়া অপরিমিত তিনপোয়া মাংস ভক্ষণ করিলে। এখন বিচার করিয়া দেখ যে, ইহা কি তোমার অসংযমী লোভী মনের দোষ, না মাংসের দোষ ? কারণ মাংস ত নিজে তোমাকে বলে নাই যে, 'আমাকে বেশী পরিমাণে ভক্ষণ করিতেই হইবে'। এইরূপ ক্ষেত্রেই মূর্খগণ নিজের লোভ রিপুর দোষ ধরিতে না পারিয়া, কেবল মাংসের উপরই দোষারোপ করিয়া থাকে। আরও দেখ, যদি তোমার পিতা, পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষানুক্রমেই মাংসাহার করিয়া আসিতেন, তবে তোমারও সেইরূপ তেজস্কর বীর্য্যেই জন্ম হইয়া তুমি মাংসাহারে অভ্যস্ত থাকিতে এবং তাহার ফলে আজ এই সামান্য তিনপোয়া মাংস তোমার ন্যায় যুবকের পাকস্থলীতে অমিতাহার বা গুরুভোজন বলিয়া বোধ হইত না। ঘৃত,

দুগ্ধ, দধি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার খাদ্যপক্ষেই ঐরূপ জানিয়া, আহারের সময় যাহাতে অমিতাহার অর্থাৎ গুরুভোজন না করা হয়, তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা প্রধান কর্ত্তব্য। কারণ একদিন অপরিমিত গুরুভোজন করিয়া পরে সাতদিবস পর্য্যন্ত উপবাস করিলেও তাহার দোষ সংশোধন হয় না, সেই ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ ইহাই নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। কমের পক্ষেও সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন যাহাতে সহজ প্রাপ্য পশু-পক্ষীর মাংসাহার করা যাইতে পারে, স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তাহার চেষ্টা করা ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।

অর্থাৎ—"শরীরই সকল প্রকার ধর্ম্ম সাধনের প্রধান বস্তু।" কারণ তোমার এই সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত শরীরটাকে লইয়াই 'আমি আছি' এই বোধে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যাদি করিয়া থাক। অতত্রব এই দেহ সুস্থ না থাকিলে তুমি কিছুই নও। কারণ তখন তোমার দ্বারা ধর্ম্ম বা অর্থ, যোগ বা ভোগ কোনটাই হইবে না। অবিচারী লোভিগণ ভোজনের সময় গুরুপাক দ্রব্য ও অপরিমিত আহার করিয়া পরে দুরন্ত্রাগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

আহার ও ধর্ম্মের সঙ্গে কি সম্বন্ধ।

মন স্থূল পঞ্চভূত জাত নয়, উহা মায়ারই ব্যষ্টিরূপ অংশ মাত্র। তাই এই ডাল, ভাত, মৎস্য, মাংসাদি স্থূল খাদ্যের গুণাগুণ কখনও মনে সংক্রামিত হইতে পারে না। স্থূল পঞ্চভূত জাত হাড়, রক্ত, মাংসে তৈয়ারী এই স্থূল দেহেই ঐ স্থূলাহারের শক্তি প্রবেশ করে মাত্র।

মন সূক্ষ্ম, তাই তাহার আহারও সেইরূপ সূক্ষ্ম শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। তাই ভাগবত বলিয়াছেন—

তেজস্বী তপস দীপ্তো দুর্দ্ধর্ষোদরভাজনঃ।
সর্ব্বভক্ষোঽপি যুক্তাত্মা নাদত্তে মলমগ্নিবৎ॥

অর্থাৎ—"তেজস্বী, তপস্বী ও পরাক্রমী যোগী সর্ব্ববস্তু ভক্ষণ করিলেও অগ্নির ন্যায় মল গ্রহণ করেন না, অর্থাৎ পাপভাগী হন না।" ইহার ভাবার্থ এই যে, অগ্নি যেরূপ পৃথিবীর যাবতীয় ময়লা বা অপবিত্র বস্তুকে পোড়াইয়া পবিত্র করিয়া দেয়, কোন ময়লাই তাহার কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না, ঠিক সেইরূপ, জ্ঞানী ব্যক্তি যে কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিলেও তাঁহার সেই জ্ঞানাগ্নিতে সমস্ত পবিত্র করিয়া দেয়, কিছুতেই তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ জ্ঞানী মহাত্মা খাদ্য গ্রহণকালে বিচারপূর্ব্বক পরিমিত ভোজন করেন বলিয়াই কোন খাদ্যে তাঁহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। সূক্ষ্ম আহার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। (নিরুক্ত)

অর্থাৎ—"(চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ইত্যাদি) ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা জাগতিক যাবতীয় বিষয় যে আহরণ করা হইয়া থাকে, তাহাকেই 'আহার' বলিয়া কথিত হয়।"

অনশন দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমকারী, কঠোর তপস্যাবান বহু ব্যক্তিই উর্ব্বশী ও রম্ভাদির নয়ন কটাক্ষে তপস্যা ভঙ্গ দ্বারা যে অধঃপতিত হইয়াছেন, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাই শাস্ত্রপ্রণেতাগণও বহু শাস্ত্রমুখে ঐরূপ নানাপ্রকার গল্প প্রসঙ্গে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে বিবিধরূপে উপদেশ দিয়া ইহাই বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, বাহ্যিক অনশন অথবা নিরামিষ আহার দ্বারা কখনও ইন্দ্রিয় সংযত হয় না। মৎস্য, মাংসাদি স্থূল আহারের দ্বারা যে মনের কোনই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তৎসম্বন্ধে স্বয়ং যোগেশ্বর মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চেন্নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিম্॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অর্থাৎ—"হে দেবি! মানবগণ বাহ্যিক আহার সংযত করিয়া ক্লেশভোগ করুক বা (মৎস্য, মাংসাদি নানা প্রকারের) যথেষ্ট আহার দ্বারা দেহকে হৃষ্টপুষ্টই করুক তাহাতে কিছুই হইবে না। তাহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন হয়, তাহা হইলে কখনও চিরসুখী হইতে বা নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।" সুতরাং হে বন্ধুগণ!

সুখী যদি হ'তে চাও,
আপনারে চিনে লও।
নিজে কে, তা' না চিনিলে,
দুঃখ যাবে না কোনকালে॥

পুনরায় শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—হে দেবি!

বায়ু-পর্ণ-কণা-তোয়-ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশু-পক্ষি জলেচরাঃ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অর্থাৎ—'যাহারা বায়ু মাত্র আহার কিংবা পর্ণ (পাতা) আহার করে অথবা কণ ভোজন (সামান্য কণিকামাত্র আহার) করে বা মাত্র জলপানরূপ ব্রত ধারণ করে, তাহাদেরই যদি মোক্ষ হয়, তাহা হইলে সর্প, পশু, পক্ষী ও জলজন্তু ইহারা সকলেই মোক্ষভাগী হইতে পারে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাত্র বাহ্যিক আহারের সংযম করিলেই যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া মোক্ষ হইবে তাহা কখনও নহে। কারণ কেবল মাত্র বাহ্যিক অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম হয় না, যদি ধর্ম্মের প্রতি মনের অনুরাগ না থাকে। এতৎসম্বন্ধে ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাস বলিয়াছেন—

তুল্‌সী পিঁদ্‌খে হরি মিলে তো, মৈঁ পেঁহু কুঁদা আউর ঝাড়।
পাথর পূজনে হরি মিলে তো, মৈঁ পূঁজু পাহাড়॥"

অর্থাৎ—"কতকগুলি তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করিলেই যদি পরাৎপর পরমেশ্বর হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে আমি একটা তুলসীর কুঁদা কণ্ঠে ধারণ করিতাম, অথবা তুলসী গাছের ঝাড় কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিতাম। আর পাথর পূজা করিলেই যদি সেই যোগেশ্বর হরিকে পাওয়া যাইত, তবে আমি পাহাড়ের পূজা করিতাম।" ভক্তিমতী মীরাবাই কহিয়াছেন—

নিত্ নাহন্‌সে হরি মিলে তো, জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো, বাদুর বাঁদরাই॥
তিরণ্ ভখন্ কে হরি মিলে তো, বহুত্ মৃগ অজা।
স্ত্রী ছোড়্‌কে হরি মিলে তো, বহুত্ রহে খোজা॥
দুধ্ পিকে হরি মিলে তো, বহুত্ বৎস বালা।
মীরা কহে বীনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা॥

অর্থাৎ—"প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিলেই যদি ভগবান হরিকে লাভ করা যায়, তাহা হইলে জলজন্তুরাই তাঁহাকে লাভ করিবে। ফলমূল ভক্ষন করিলেই যদি হরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে বাঁদুড় ও বানরগণই ভগবানকে প্রাপ্ত হইবে। আর তৃণ ভোজন করিলেই যদি হরিকে লাভ করা যায়, তবে ছাগল ও হরিণগণ ভগবানকে লাভ করিবে। নারীসঙ্গ বিসর্জ্জন করিলেই যদি হরি পাওয়া যাইত, তবে খোজারাই তাঁহাকে পাইত এবং যদি কেবল দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিলেই ভগবানকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বৎস ও শিশু বালক-বালিকাগণই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মীরার মত এই যে, সেই ভগবানকে লাভ করার জন্য, যত কিছু বাহ্যিক অনুষ্ঠানই করা যাউক না কেন, তৎপ্রতি মনের প্রকৃত অনুরাগ (প্রেম) না হইলে আর কিছুতেই সেই ভগবানকে লাভ করা যায় না।"

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদির উক্তিতে এখন সহজেই প্রমাণ হইল যে, এই স্থূলাহার সংযম দ্বারা কামাদি প্রবৃত্তি কখনও নিবৃত্তি হয় না। ইহার আরও

প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ,—অসংযমী বহু স্ত্রী পুরুষগণ অথবা বৈরাগী ও বৈষ্ণবীর দল নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া বাহ্যিক ধর্ম্মের ভাণ করে, অথচ তাহাদের মনকে সংযত রাখিতে না পারায় গুপ্তভাবে যে ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যা করিয়া থাকে—একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকি থাকিবে না। অপরদিকে, নিরামিষভোজী ব্যতীত অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বহু সংযমী স্ত্রী-পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের সমাজোচিত খাদ্য পেঁয়াজ, রসুন এবং নানাপ্রকার মাংসাদি খাইয়াও প্রবল রিপুকে সংযত রাখিয়া চলিতেছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, নিরামিষ আহার দ্বারা মনের কামাদি বৃত্তির নিবৃত্তি অথবা আমিষ আহার দ্বারা কামাদি বৃত্তির উত্তেজনা কিছুই হয় না। অতএব বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গণকে নিরামিষ আহার দ্বারা দুর্ব্বল করিয়া রাখিলে কি হইবে? ইন্দ্রিয়গণের নিজের কোনই স্বাধীন ক্ষমতা নাই, ভিতর হইতে মনের নিজ স্বভাবানুযায়ী মন যখন যেরূপ আদেশ করিবে, ইন্দ্রিয়গণ নির্ব্বিচারে তখনই তাহা পালন করিতে বাধ্য। কাজেই বাহ্যিক আমিষ ও নিরামিষ আহার লইয়া সমাজে কলহ দ্বারা অশান্তির সৃষ্টি করিয়া কেন বৃথা দুঃখ ভোগ করিতেছ?

নেশা সেবিগণের নেশার মত্ততা দেখিয়া অনেক অজ্ঞ লোকে বলিয়া থাকে যে, 'নেশা পান করার ফলে মন বিকলিত হয়, ইহা সর্ব্বদাই দেখিতেছি। বিভিন্ন খাদ্যের নানারূপ আস্বাদ এবং তাহাদের গুণও ভিন্ন ভিন্নই হইয়া থাকে, অতএব খাদ্যের পার্থক্যে মনের বৈচিত্র লাভ করা সম্ভবপর হইবে না কেন? ইত্যাদি'। মনে কর একই ভাঙ্গ একই পাত্রে প্রস্তুত করিয়া অনেক লোকে পান করিল। সেই নেশায় তাহাদের মধ্যে কেহবা কামাতুর হইল, কেহবা ক্রোধান্বিত হইয়া মাতলামি করিতে আরম্ভ করিল, আবার কেহবা খুবই ভক্তিযুক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্ম বিষয়ক গান করিতে আরম্ভ করিল। অর্থাৎ একই ভাঙ্গ পান করিয়া

ঐ ভাঙ্গপায়ীদের সকলের মনে একই ভাবের উদয় না হইয়া প্রত্যেকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। কাজেই এখানে ভাঙ্গ পান করার ফলে মন বিকলিত হইয়াছে বলিয়া কি প্রকারে বলিবে? যদি তাহাই হইত, তবে ঐ একই দ্রব্য পান করার ফলে উহাদের সকলের মনে ঠিক একই ভাবের উদয় হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐ মাদক দ্রব্য পান করায় জীবের মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া মনের বৃত্তি গুলি তীব্রবেগে ক্রিয়া করিতেছে মাত্র। সেইজন্যই উহাদের যাহার মনের যেরূপ বৃত্তি পূর্ব্ব হইতেই স্বাভাবিক ছিল, সে সেইরূপই কার্য্য করিতেছে। অতএব ঐ মাদক দ্রব্য সেবনে যে মন বিকলিত হইয়াছে, একথা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ মনের পৃথকত্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকাতেই বিচারহীন লোক জড় খাদ্যের গুণাগুণ মনে সংক্রামিত হয় বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করিয়া থাকে।

এখন এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শাস্ত্রে যে নিরামিষ আহার করিতে এবং আহার শুদ্ধি করিতে পুনঃপুনঃ আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা? না, বাস্তব—তাহা সম্পূর্ণ সত্যই বটে। আমিষ ও নিরামিষ আহার বিষয়ে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

আমিষং বিষয়াঃ তদভিলাষরাহিত্যং
নিরামিষং আমিষ বর্জ্জনং বা। (দেবলভাষ্য)

অর্থাৎ—"জাগতিক ধন-জনাদি সমস্ত ভোগ্য বিষয়কেই আমিষ বলা হয়। অতএব সেই বিষয় ভোগের অভিলাষ রহিত হইয়া গেলেই তাহাকে নিরামিষ বা আমিষ বর্জ্জন বলিয়া কথিত হয়।" এইরূপ সূক্ষ্মদর্শী আত্মজ্ঞানিগণ 'আমিষ' শব্দে শাস্ত্রে ধন-জনাদি যে কোনও ভোগ বস্তুকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং বিষয় ভোগের তীব্রেচ্ছা থাকা পর্য্যন্ত কিছুতেই নিরামিষ ভোজন হইতে পারে না। এজন্য আহার শুদ্ধি করা বিষয়েও শাস্ত্রেই পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন—

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

(ঐ মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য)

বিষয়োপলব্ধিলক্ষনস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধিঃ।
রাগদ্বেষ-মোহ-দোষৈরসংস্পৃষ্টবিষয়বিজ্ঞানমিত্যর্থঃ॥

অর্থাৎ—"যাহা আহৃত (সংগৃহীত) হয়, তাহারই নাম আহার। অর্থাৎ শব্দাদি ভোগ্য বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানকেই আহার বলা হয়। কেননা, ভোক্তার ভোগ নিস্পাদনার্থই ঐ সমস্ত বিষয় সংগৃহীত হইয়া থাকে। শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুভবাত্মক যে বিজ্ঞান, তাহার শুদ্ধি আহার শুদ্ধি। অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষ সংস্পর্শ রহিত শব্দাদি বিষয়ের যে অনুভূতি তাহাই আহার শুদ্ধি। সেই আহারের বিষয় বিজ্ঞানের শুদ্ধি হইলে পর তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তির সত্ত্বশুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ নামক বুদ্ধি সত্ত্বের নির্ম্মলতা সিদ্ধ হয়। সত্ত্বশুদ্ধি সিদ্ধ হইলে পর তৎপূর্ব্বে ভূমা আত্মার যেরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে ধ্রুবা অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিধারা উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাহার তদ্বিষয়ক স্মরণ কখনও বিলুপ্ত হয় না। ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হইলে পর জন্মজন্মান্তরানুভবের বাসনাবশে দৃঢ়ীভূত হৃদয়াশ্রিত গ্রন্থি সমূহের অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত সর্ব্বপ্রকার অনর্থ রূপ পাশ বা বন্ধন রজ্জু সমূহের বিপ্রমোক্ষ (বিশেষরূপে মোক্ষ) অর্থাৎ বিনাশ হইয়া যায়। যেহেতু উক্ত আহার শুদ্ধিই উত্তরোত্তর অবস্থিত এই সমস্ত সাধনের মূল কারণ, সেই হেতু ঐ আহার শুদ্ধি করা সকলেরই একান্ত আবশ্যক।"

ইহার ভাবার্থ এই যে—ভোক্তার ভোগের নিমিত্তই চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যিক দর্শন, শ্রবনাদি বিষয়সকলকে গ্রহণ করে এবং তাহারই নাম আহার। সেই আহার গ্রহণ করিবার সময়, রাগ, দ্বেষাদি, সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত হইয়া, যে নির্ব্বিকার অবস্থায় গ্রহণ করা হয় তাহারই নাম আহার শুদ্ধি। এইরূপে আহার শুদ্ধি হইলেই, জীবের অন্তঃকরণ নামক

বুদ্ধি সত্ত্বের নির্ম্মলতা আসে এবং তাহাকেই সত্ত্বশুদ্ধি কহে। এই সত্ত্বশুদ্ধি হইলেই সেই পরমাত্মা বিষয়ে জ্ঞান দৃঢ় নিশ্চয় ভাব ধারণ করিয়া অবিরাম সেই জ্ঞান-স্রোত বহিতে থাকে এবং তদ্দারা হৃদয়স্থিত অবিদ্যা বা মায়া রজ্জুর বন্ধনসকল ছিন্ন হইয়া গিয়া জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আহার শুদ্ধিই ক্রমে জীবের মোক্ষ প্রাপ্তির একমাত্র প্রধান মূল কারণ। অতএব জীব মাত্রেরই ঐরূপ আহার শুদ্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বাক্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে, এই স্থূল নিরামিষ আহার দ্বারাই প্রকৃত নিরামিষ আহার হয় না বা আহার শুদ্ধিও হয় না। সুতরাং এই নিরামিষ আহারে চিত্তশুদ্ধিও জন্মিতে পারে না। এই নিরামিষ আহার দ্বারা বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলি সাময়িক তমোগুণের প্রধান লক্ষণ দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে মাত্র কিন্তু অভ্যন্তরে মন পূর্ব্বের ন্যায় সেই অসংযত অবস্থায়ই থাকিয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিরামিষ আহারে রিপুর সংযম না হইয়া বরং দিনদিন দেহেন্দ্রিয় সমূহ ক্ষীণ হইয়া গিয়া তমোগুণেরই বৃদ্ধি করে।

অন্ন বা স্থূল পঞ্চভূত হইতে মন কখনও সৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই এই জড় খাদ্যের গুণাগুণ দ্বারা সেই মনোবৃত্তিসকল উত্তেজিত বা প্রশমিত কিছুই হয় না। কর্ত্তারূপী মন অনুগত ভৃত্যরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যোদ্ধার করাইয়া লয়। অতত্রব তোমাদের ইন্দ্রিয়সকল রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে এই স্থূল ও জড় খাদ্য লইয়া লোক-সমাজে সাম্প্রদায়িক কলহ ও হুলুস্থূলু করিয়া অশান্তির সৃষ্টি না করিয়া, নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী মৎস্য-মাংসাদি ও নিরামিষ দ্বারা স্বাভাবিক মিতাহারে ব্রহ্মচর্য্য পালনকরতঃ শরীরকে সুস্থ রাখ এবং সর্ব্বদা সৎসঙ্গ ও জ্ঞানী মহাপুরুষদের সদুপদেশ শ্রবণকরতঃ তদ্দ্বারা তোমাদের মনকে সংযত রাখিয়া ক্রমে সেই মনকে নিরোধ করিতে পারিলেই দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ সকলেই রুদ্ধ হইয়া গিয়া পরমার্থ চিন্তায় বা আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইবে। ইহাই আত্মোন্নতির প্রধান উপায় এবং ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের বাণী।

স্থূলাহার ও সূক্ষ্মাহারের ভেদ।

মানবের মন, কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় আহরণ করে। সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রবেত্তা জ্ঞানী মহাপুরুষগণ সেই আহরণকেই আহার বলিয়া থাকেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে আহার দুই প্রকার। ডাল, ভাত, মাংস, রুটি ইত্যাদি স্থূল জিনিজ দ্বারা হাড়, রক্ত, মাংসে গঠিত এই স্থূল দেহ যে আহার করে তাহার নাম স্থূলাহার এবং জাগতিক বিষয় সকলের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণ যুক্ত হইয়া বিষয় সম্ভোগে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ দ্বারা যে বিষয়ের স্বাদ আহরণ করে, তাহারই নাম মনের আহার বা সূক্ষ্মাহার। মনে কর তুমি সন্দেশ খাইতেছ। এই সন্দেশের মধ্যে দুইটী ভাগ আছে। একটী সন্দেশের মিষ্ট স্বাদ, ইহা চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না, তাই ইহা অতি সূক্ষ্ম। অন্যটা ছানা ও চিনি, ইহা চোখে দেখা যায়, তাই ইহা স্থূল। তোমার মন সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা দ্বারা সন্দেশের ঐ মিষ্ট স্বাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইল। ইহাই মনের আহার বা সূক্ষ্মাহার। ঐ সন্দেশের ছানা ও চিনির অংশ তোমার উদরস্থ হইয়া তাহার শক্তি তোমার এই হাড় মাংসে তৈয়ারী স্থূল দেহে প্রবেশ করিয়া তোমার শরীরকে হৃষ্ট-পুষ্ট করিল, তাই ইহা স্থূলাহার বলিয়া কথিত। ঠিক এই ভাবে সকল মানবই স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকারের আহার করিয়া থাকে,—কিন্তু সাধারণের ইহা বোধাতীত। এই দুই প্রকার আহারের মধ্যে সূক্ষ্ম আহারেরই শক্তি প্রবল। কারণ যে বস্তু যত সূক্ষ্ম, তাহার শক্তি তত অধিক (যেমন আধুনিক অনুবোমা ও স্পুটনিক)—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এইজন্য শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়ৈ বিষয়ানামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। (নিরুক্ত)

অর্থাৎ—"(চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) এই জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা জাগতিক যাবতীয় বিষয় যে আহরণ করা হয়, তাহাকেই 'আহার' বলিয়া কথিত হয়।" এই স্থূলাহারের মধ্যে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে সেই খাদ্য খাওয়াতে যেরূপ স্থূল দেহে ব্যাধি জন্মে, ঘোর বিষয়ভোগীর বা অসতের সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বদা অসৎভাবে ও জঘন্য প্রবৃত্তিতে বিষয় ভোগ সংক্রান্ত নানাপ্রকার কুৎসিত বাক্য শ্রবণ ও কুৎসিত দর্শন, স্পর্শনাদি দ্বারা মন কুৎসিত খাদ্য গ্রহণ করিলে সেই মনেরও বিকার হইয়া অধোগতিরূপ ব্যাধি জন্মে। আবার শরীরতত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ চিকিৎসকগণের সঙ্গ করিয়া তাহাদের হিতোপদেশ মতে ঔষধ সেবনাদি দ্বারা যেরূপ এই স্থূলদেহ ব্যাধি মুক্ত হইয়া শক্তি লাভ করে, মনস্তত্ত্ববিদ্ অর্থাৎ ভবব্যাধি চিকিৎসক আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণের সঙ্গ করিয়া সৎকথা শ্রবণ ও জ্ঞাননেত্রে দর্শনাদি রূপ ঔষধ সেবন দ্বারা মনের ময়লাসকল বিদূরিত হইয়া গিয়া মন নিরোগ ও শক্তিশালী হয়। মনে কর, তুমি কোন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট বসিয়া আছ। এমন সময় একটা পরমাসুন্দরী যুবতী সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিবার জন্য কিছু ফল হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ঐ যুবতীকে দেখা মাত্রই তোমার মন তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে সম্ভোগ করার কামনায়, তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এমন কি, তখন তোমার মন এত কামনাপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেই স্ত্রীলোকটীর হাতে কি কি ফল ছিল, তাহাও তোমার মনের দেখিবার অবসর ছিল না। তোমার মন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই যে সুন্দরীর রূপ আহরণ করিল, এই আহার করিবার সময় মন কামনাযুক্ত হইয়া (বিকারগ্রস্ত হইয়া) আহার করিয়াছিল। তোমার মনের এই আহার বিকারগ্রস্ত, কামনাপূর্ণ বলিয়াই ইহা 'সাত্ত্বিক আহার' হয় নাই,—ইহা 'তামসিক আহার'। কাজেই তোমার মনের আহারশুদ্ধিও হয় নাই। পক্ষান্তরে, সেই অলৌকিক সুন্দরী যুবতীকে দেখিবা মাত্রই এই মহাপুরুষের মন ভাবিল যে, 'ইহা আমার দেহের

মতই হাড়-রক্ত-মাংসে তৈয়ারী একটী পুতুল বই আর কিছুই নয়। মাটির পুতুলগুলি যেরূপ কোনটী কাল, কোনটী লাল রং করিয়া লোকে তৈয়ার করে, কিন্তু সেই সমস্ত পুতুলের ভিতরে এক মাটি ভিন্ন আর কিছুই নাই; মায়া-সৃষ্ট এই হাড়-রক্ত-মাংসে তৈয়ারী পুতুলগুলিও ঠিক তদ্রূপ। ঐ যুবতীর শরীরও ঠিক আমার শরীরেরই মত ভিতরে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত, মাংস ও মল-মূত্রাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে'। এইভাবে সেই মহাপুরুষ নিজের দেহ ও স্ত্রীলোকটীর দেহ এক মায়ারই কল্পনা মনে করিয়া, উভয় দেহ সমজ্ঞানে সেই যুবতীকে মাতৃ সম্বোধনে বসিতে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহার প্রদত্ত ফল গ্রহণ করিয়া তাহাকে প্রসাদও দিলেন। স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে কথোপকথন করিয়া এবং তাহার হাতে হাত লাগাইয়া ফল গ্রহণ করিয়াও সেই মহাপুরুষের মনে কাম-ক্রোধাদি কোন বিকার জন্মিল না। মহাপুরুষের মন, কাম-ক্রোধাদি কোন বিকারযুক্ত না হইয়াই সেই স্ত্রীলোকটীর রূপ আহার করিয়াছিল, তাই তাহার নাম 'সাত্ত্বিক-আহার' এবং এই কারণেই মহাপুরুষের মনের আহার শুদ্ধি হইয়াছে। ঠিক এইভাবে চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়কে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষের ন্যায় যখন তোমার মন বিচারপূর্ব্বক নির্ব্বিকারভাবে আহার (গ্রহণ) করিতে পারিবে, তখনই তোমার মনের 'আহার শুদ্ধি' হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ঐ স্থূলাহারও আবার অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার যথা :—

১। আহার করিবার সময় বিচারহীন, লোভী ও বিলাসী ব্যক্তি জিহ্বায় লোভ রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া আহর্য্যের দোষগুণ বিচার না করিয়া গুরুপক্ক দ্রব্য গুরুভোজন করিয়া থাকে। তাহার ফলে তাহার দেহে দুর্ব্বলতা ও নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়া অশেষ দুঃখকষ্টে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ইহারই নাম 'অধমাহার'।

২। যে ব্যক্তি নির্লোভ হইয়া দ্রব্য গুণাগুণ বিচার করিয়া স্নিগ্ধ আয়ু-বৃদ্ধিকর, সত্ত্ব-বৃদ্ধিকর, বলকর, স্থায়ী এবং সুখ ও প্রীতি-বর্দ্ধনকর

লঘুপাচ্য দ্রব্য পরিমিতাহার করিয়া থাকে তাহাকে 'মধ্যমাহার' কহে ।

৩। যোগিগণ শৌচাশৌচ ও বিচার সংস্কারহীন হইয়া এবং আকিঞ্চন ও আহরণাদি কোন রিপুর বশবর্ত্তী না হইয়া স্পৃহাশূন্য নির্ব্বিকার অবস্থায় অনায়াসলব্ধ দ্রব্যের দ্বারা যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন, তাহাই 'উত্তমাহার'। এই উত্তমাহার বিষয়ে বেদান্ত বলিতেছেন—

চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষচর্য্যং চরেৎ ।
যথালাভমশ্নীয়াৎ প্রাণসন্ধারণার্থম্ ॥ (কঠোপনিষদ্)

অর্থাৎ—"সন্ন্যাসী (আত্মজ্ঞানী সংসারত্যাগী মহাপুরুষ) ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের নিকটেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং প্রাণরক্ষার্থ যখন যে ভাবে যাহা প্রাপ্ত হন তাহাই ভক্ষণ করিবেন।" স্বয়ং মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন—

বিপ্রান্নং শ্বপচান্নং বা যস্মাত্তস্মাৎ সমাগতম্ ।
দেশং কালং তথাপাত্রমশ্নীয়াদবিচারয়ন্ । (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অর্থাৎ—"হে দেবি ! ব্রাহ্মণের অন্নই হউক বা চণ্ডালের অন্নই হউক, যে কোন ব্যক্তির অন্ন যে কোনও দেশ হইতে সমাগত হউক না কেন তাহা দেশকাল বিচার না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ভোজন করিবেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছুই বিচার্য্য বিষয় নয়।"

অতএব দেখা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত অধমাহার দ্বারা লোভীর স্বাস্থ্য ও বল সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়া সেই আহার তাহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই দুঃখদায়ক হয়। আর মধ্যমাহারীর দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ নিজ দেহের উপর 'এই দেহই আমি' এইরূপ বোধ থাকায়, দ্রব্যের দোষ-গুণ বিচার দ্বারা খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচন করার জন্য মনে নানাপ্রকার বিক্ষিপ্ততা উপস্থিত হইয়া, তাহাকে অশান্তি দেয়। কিন্তু ঐ সকল অহঙ্কারাদি ত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ যোগীপুরুষ প্রারব্ধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিয়া যখন যেখান হইতে যাহা আসে, সেই সহজ প্রাপ্য বস্তু দ্বারা উত্তমাহার করেন। তাই তাঁহাদের দেহ ও মন নীরোগ থাকিয়া প্রশান্ত ভাব ধারণকরতঃ তাহাদিগকে পরম শান্তি দান করে।

সূক্ষ্ম মানসিক আহারেও অবস্থা ভেদে তিন প্রকারে মনের বিচিত্রতা প্রকাশ করে, যথা—সূক্ষ্মাহার, সূক্ষ্মতরাহার ও সূক্ষ্মতমাহার।

১। বাসনারূপ ক্ষুধানলে অভিভূত হইয়া জীবসকল সেই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ইন্দ্রিয় সংযোগে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিষয় উপভোগ করাতে সেই জঠরানল নির্ব্বাপিত না হইয়া বরং তাহাতে রাগ-দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মোহাদি রোগে জীবকে আরও সন্তপ্ত করিয়া তোলে। ইহাই মনের 'সূক্ষ্মাহার'।

২। পূর্ব্বোক্ত বিষয়াহারে সন্তপ্ত মন (জীব)সকল ঐ ব্যাধি নিবৃত্তির জন্য শম, দম, শ্রদ্ধা, তিতিক্ষা ও বিরতি প্রভৃতি সূক্ষ্মতর সুপথ্য সেবন করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হইয়া বৈরাগ্য প্রভাবে সেই বাসনানল পূর্ণ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই মনের 'সূক্ষ্মতরাহার' বলা হয়।

৩। সমাধি প্রাপ্ত যোগী আত্মানন্দামৃত পান করিয়া সূক্ষ্মতমাহার করেন। তখন আহারী ও আহার এবং আহার্য্য এই তিনের কোনই পার্থক্য না থাকিয়া, উহাদের সমস্তই মিলিত হইয়া একাকার হইয়া যায়। অর্থাৎ ভোগ্য, ভোগ ও ভোক্তা এই তিনটি একেরই বিকাশ মাত্র, তাই পুনরায় তিনটী একাকার হইয়া একেই লয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই মনের 'সূক্ষ্মতমাহার'। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন—

অহমন্নম্ অহমন্নম্ অহমন্নম্।

অহমন্নাদো, অহমন্নাদো, অহমন্নাদোঃ ॥ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

অর্থাৎ—"আমিই অন্ন এবং আমিই অন্ন ভক্ষক। অর্থাৎ ভোগ্য, ভোগ ও ভোক্তা সমস্তই একমাত্র আমি (ব্রহ্ম)।"

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি নিবেদন।

হে ভারতের নিরামিষভোজী ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভ্রাতাগণ! আপনারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহবা ক্রোধভরে আমাকে অনেক কিছু কটু-কাটব্যাদি বলিবেন। আমিও বিদেশী নই, এই ভারতেই বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু কোন অভিমান নাই বা এই গ্রন্থে দেশবাসীকে নিন্দা ও নির্য্যাতন করিয়া নিজের কোন প্রভুত্ব বা গৌরব অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যও নাই। শ্রুতিসুখকর না হইলেও ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথায় সত্যপ্রিয় বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাই কেবল মিথ্যা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, অজ্ঞ মূর্খগণের স্তুতি করিয়া দেশকে আর অধঃপাতে দিতে ইচ্ছা করে না। ইহাও আপনাদের মনে রাখা উচিত যে, নিন্দার ভয়ে ভীত বা যশের আকাঙ্খিত ব্যক্তি কখনও এইরূপ অপ্রিয় গ্রন্থ লিখে না। নিজের দোষ নিজে না দেখা পর্য্যন্ত কাহারও উন্নতি লাভ হয় না। আমার সহিত দেশের রক্তের সম্বন্ধ। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মন কাঁদে, তাই নিজ দেশের দোষ দেখাইয়া মনোদুঃখে অনেক রুক্ষ বাক্য বলিতে বাধ্য হইলাম। অতএব সুপণ্ডিতগণ এই গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন করাইয়া দিলে, আমি তাহাকে গুরুজ্ঞানে বরণ করিব। কারণ ভ্রম বিদূরিত হইয়া গিয়া সত্যের প্রচার হয়, ইহাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য।

মনে হয় যেন বিগত সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া আমাদের জাতীয় জীবনের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে, কিরূপে আমাদিগকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলিবে। তাই সত্যের অপলাপ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে ক্রমে আমরা কীটতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন যাহার ইচ্ছা সেই মারিয়া যায়। অতএব হঠাৎ আমার উপরে ক্রোধান্বিত

না হইয়া, আপনারা একবার স্থিরচিত্তে নিজের ও দেশের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, ব্রাহ্মণগণ দেশের কি সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। 'বেদ-বেদান্ত পাঠে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির অধিকার নাই' বলিয়া মিথ্যা (বেদে যাহা নাই এইরূপ) গ্রন্থাদি লিখিয়া ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য সকল জাতিকে অন্ধকারে রাখিয়াছিলেন, তাই আজ নিজেরাও অন্ধকারে পড়িয়াছেন। এখন স্বচক্ষে চাহিয়া দেখুন যে, আমরা যাহাদিগকে শূদ্রাদি নীচ জাতি অপেক্ষাও অতি ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া মনে করিতাম, আজ সেই ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশবাসিগণই বর্ত্তমানে আমাদের অস্পৃশ্য ও অখাদ্য (অথচ সেই বেদ-বেদান্তের আদিষ্ট) মাংসাদি নানাপ্রকার আমিষ আহার্য্যের শক্তি দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ করিয়া বেদ-বেদান্ত পাঠের পূর্ণ অধিকারী হইয়া তাহা পাঠ করিতেছে ও করাইতেছে। আর, আমরা পুরাকালের সেই ঋষিদের বিধান মতে মাংসাহার না করিয়া, নিজ নিজ নব্য মতানুযায়ী কেবল শাক-সব্জী ও কুষ্মাণ্ড খাইতে খাইতে এখন আমাদের মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হওয়ায় সেই বেদান্ত পাঠের সম্পূর্ণ অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছি। সেই শূদ্রাদি জাতিও এখন আর আমাদের মিথ্যা কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনাক্রমে তত্ত্ব অবগত হইতেছে। বেদ-বেদান্তের সত্য ত্যাগ করিয়া মিথ্যা প্রচারের ফলে আজ ব্রাহ্মণ জাতি সকলের মুখাপেক্ষী ও সর্ব্বজাতির অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে।

আর, বৈষ্ণব ভ্রাতাগণ! নানাপ্রকার পশু-পক্ষীর মাংসাহারের কথা শুনিয়া আপনারা ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। কারণ এই সাধারণ মাংসাহার করাতেই যদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় বা তদ্দ্বারা বিষ্ণু অপবিত্র হন, তবে এইরূপ অতি ক্ষুদ্র বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া এত সঙ্কীর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালন করা আপনাদের কোন ক্রমেই সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ আপনাদের মনঃকল্পিত ঐরূপ অতি ক্ষুদ্র বিষ্ণু বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং দেশের যথেষ্ট ক্ষতি কারক।

উহাতে কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক রটাইয়া এবং সাম্প্রদায়িক দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষির সৃষ্টি করিয়া দেশকে রসাতলে দেওয়ার পন্থা হইতেছে মাত্র। বিষ্ণু অর্থাৎ তিনি ব্যাপক। এই দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য অনন্ত জগৎ তিনি ব্যাপিয়া আছেন, তাই তিনি অসীম অনন্ত। মহিষ, শূকর, ছাগল, ভেড়া, ও মুরগী প্রভৃতি সমস্ত পশু-পক্ষীর রক্তের প্রত্যেক বিন্দুতে বিন্দুতে এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমভাবে যে সেই বিষ্ণু বিরাজমান আছেন, এই বিষ্ণুতত্ত্ব সেই পুরাকালের সমস্ত বৈষ্ণবগণ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন বলিয়াই ঐ সকল অসংখ্য পশু-পক্ষীর মাংসাহার করিয়াও সেকালের বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণবধর্ম্ম বা বিষ্ণু কিছুতেই অপবিত্র হইতেন না। তাই বলিতেছি, আপনাদের মনঃকল্পিত এই ক্ষুদ্র বিষ্ণুকে ত্যাগ করিয়া এখন আপনারাও সেই পুরাকালের অসীম অনন্ত বিষ্ণুর আরাধনা করুন। তবেই দেখিতে পাইবেন যে, মাংস কেন, মহামাংস ভোজন করিলেও কিছুতেই কেহ সেই বিষ্ণুত্ব বা বৈষ্ণবত্ব নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। আপনাদের মিথ্যা ও কুসংস্কার প্রচারের দরুণ এই দেশবাসী মাত্র শাক-সব্জী ভক্ষণ করিতে করিতে হীনবীর্য্য হইয়া দিনদিন রসাতলে যাইতে চলিয়াছে। ঘাস পাতা খাইয়া যত পেট্‌রোগা বাবাজীর দলে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। উহা সত্ত্বগুণের চিহ্ন নয়, মহা তমোগুণের ছায়া।* আর, ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের অবিচারের ফলে বহু হিন্দুই খৃষ্টানাদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করায় হিন্দুর সংখ্যাও দিনদিন মুষ্টিমের হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে প্রথম বয়সে গুরুগৃহে যাইয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিবার প্রথা ছিল। এখনও স্কুল কলেজে গুরুর নিকট যাইয়া ছেলেরা বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে। কিন্তু সেই যুগে যে সকল বিদ্যার্থী ভারতের বিদ্যাশিক্ষান্তে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশীয়

---

*ওজস্বিতা, মুখের উজ্জ্বলতা. হৃদয়ে উদ্যম উৎসাহ, নির্ভীকতা ইত্যাদি সত্ত্বগুণের চিহ্ন। ক্রোধ, লোভ এবং কার্য্য ফল প্রাপ্তির ব্যাঘাতে অধীরতা ইত্যাদি ভাবগুলি রজোগুণের লক্ষণ। আলস্য, জড়তা, মোহ, নিদ্রা, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা ইত্যাদি তমোগুণের লক্ষণ।

বৈজ্ঞানিক, শিল্পী প্রভৃতি গুরুগনের নিকট নানাপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার্থে গমন করিয়া, বিদ্যাশিক্ষান্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে সমাজে 'একঘরে' অর্থাৎ জল অচল করিয়া রাখিতেন। ঐ সকল পণ্ডিতগণ নিজেরা মনে মনে গর্ব্ব করিতেন যে, তাহারা সমাজের ও দেশের অনেক হিত সাধন করিয়া আসিতেছেন। তাহারা একবারও চিন্তা করিয়া বুঝিতে চাহেন নাই যে, ঐরূপ অন্যায় ব্যবস্থা দ্বারা দেশের ও সমাজের জ্ঞানোন্নতির মুলে কতদূর কঠিন কুঠারাঘাত করিয়া নিজেরা রসাতলে যাওয়ার পথ প্রস্তুত করিতেছেন। অথচ ঐ সকল পণ্ডিতগণই আবার শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সকলকে উপদেশ করিবার সময় বলিতেন, 'উত্তম বিদ্যা ও মণিমুক্তাদি রত্ন অতি জঘন্য স্থান হইতেও সযত্নে সংগ্রহ করিবে, ইহা শাস্ত্রেরই বিধান'। এ-বিষয়ে তুলসীদাসও বলিয়াছেন—

উত্তম বিদ্যা লীজিয়ে, যদ্যপি নীচপৈ হোয়।
পস্যো অপাবন ঠৌর মে, কঞ্চন ত্যজত ন কোয় ॥

অর্থাৎ—"নীচ লোকের সকাশ হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। কারণ অশুচি স্থানে থাকিলেও কাঞ্চন কখনও পরিত্যাজ্য হয় না।" এতদ্‌সম্বন্ধে শাস্ত্রেও বহু দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তবে তখন পণ্ডিতগণ কোন্ যুক্তিতে ঐ সকল বিদ্যার্থীদিগের ছোঁয়া জল সমাজে বন্ধ করিতেন? লাহোর অঞ্চলে শিখ সম্প্রদায়ের 'শুদ্ধিসভা' নামে সভা আছে। যে সকল শিখ কোন কারণে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার শিখ হইবার প্রার্থনা করে, তবে মন্ত্র দ্বারা তাহাদের পাপ প্রক্ষালন করিয়া এই শুদ্ধিসভা তাহাদিগকে পুনরায় শিখ করিয়া থাকে। কিন্তু আপনাদের বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র ও হরি, কৃষ্ণ, রাম, কালী, দুর্গা-নাম এবং গঙ্গোদক কি এতই হীনশক্তি হইয়া গিয়াছে যে, কেহ জাতিভ্রষ্ট বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে অথবা অপবিত্র কোন খাদ্য খাইলে ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র ও নামাদি দ্বারা তাহার সেই পাপ প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় তাহাকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে না? যদি তাহাই হয়, তবে আর সেই সকল

বৃথা শাস্ত্রবাক্য ও নামোচ্চারণে চীৎকার করিয়া অযথা সময় নষ্ট করা কোনক্রমেই অপনাদের যুক্তিযুক্ত নয়। আপনারা একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন যে, এই ভারতবর্ষের মত এত অধিক তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। বাহিরে সাত্ত্বিকের ভাণ ও ধর্ম্মের নিশান, ভিতরে একেবারে মিথ্যা, কপটতা ও ইট্‌ পাট্‌কেলের মত জড়ত্বপূর্ণ। ইহাতে দিনদিন দেশের অধোগতি বৈ আর কি হইতে পারে?

অতএব এখনও সময় থাকিতে সত্যের প্রচার দ্বারা মিথ্যা কুসংস্কার দূর করিয়া দেশকে রক্ষা করুন। 'আমি ব্রাহ্মণ,' 'আমি বৈষ্ণব,' ইত্যাদি গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া থাকিবার আর সময় নাই। সুতরাং সর্ব্বসম্প্রদায় খাদ্যাখাদ্যাদি সম্বন্ধে একমতে চলিয়া সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রচার দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়েও একত্রিত হইবার চেষ্টা করিয়া দেশের পুনরুত্থান করুন। আহার ও ধর্ম্মের একতা আসিলেই তখন দেখিতে পাইবেন, দেশের শক্তি ও তেজ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশ শান্তি-পূর্ণ হইয়া মুক্ত হওয়ার দিকে কত অগ্রসর হইতেছে। আজ একমাত্র আহার ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের রেষারেষি এবং কুসংস্কারদি মিথ্যার আগুণ জ্বালিয়া আপনারা এই ভারতকে ছারখার করিতেছেন। অবিলম্বে সত্যের বারিধারায় সে আগুণ নির্ব্বাণ করুন।

ওহে আমার ভারতবাসী হিন্দু বন্ধুগণ! আমরা যে শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া চীৎকার করি, সেই বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, পুরাণ ও আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র কাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে? যদি বলেন, মানুষের জন্য,—তবে আমরা সেই মানুষ। কাজেই আমাদেরই সেই সকল শাস্ত্রাদেশমতে খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া আহার করিতে হইবে। বন্ধুগণ! আপনারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে, আমরা একমাত্র বেদ-বেদান্ত ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সত্য বিষয় ত্যাগ করিয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে পথভ্রষ্ট হওয়াতেই নিরামিষাহার দ্বারা আমাদের শারীরিক দুর্ব্বলতা

আনিয়া মনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছি এবং নানাপ্রকার ব্যধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছি। আর যতদিন জীবিত থাকি ততদিনও ঐ ক্ষীণাঙ্গ দুর্ব্বল শরীর দ্বারা যোগ বা ভোগ কোনটারই পূর্ণাধিকারী হইতে না পারিয়া কেবল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যখন নিরামিষভোজী হিন্দুদিগকে অসংখ্য নূতন ব্যাধিতে আক্রমণ করে, তখন চিকিৎসকগণ আসিয়া মাংসর সংযুক্ত বিলাতী ঔষধ ও পথ্যাদি সেবন করাইয়া সেই সকল ব্যাধি দুর করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল নিরামিভোজিগণ যদি সুস্থাবস্থায়ই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাদেশানুযায়ী বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক মহিষ, শূকর এবং কুক্কুটাদি নানা প্রকার পশু-পক্ষীর মাংস পরিমিত আহার করিত, তবে আর তাহাদিগকে শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং দুরারোগগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অযথা বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত না। সুতরাং ঐরূপ শারীরিক দুর্ব্বলতা ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করা এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াই কি হিন্দুদিগের পুণ্যাত্মার পরিচায়ক চিহ্ন? সর্ব্ব শাস্ত্রোপদেশমতে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও বিদ্যা (জ্ঞান) একাধারে থাকাকেই স্বর্গসুখ কহে।

বিদ্যা আর স্বাস্থ্য যদি একাধারে রয়,
বাসনার ক্ষয় হ'লে স্বর্গসুখ হয়।
মুক্তির কারণ হয় বিষয় বৈরাগ্য।
বিচার বিহীন জন ইহার অযোগ্য ॥

আমার এই গ্রন্থের শাস্ত্রাদি যুক্তিপ্রমাণ এবং মতামত দেখিয়া অনেকেই 'ছি' 'ছি' করিবেন, কেহবা নাক সিটকাইয়া উচ্চ হাস্যও করিবেন বটে, কিন্তু কালাপাহাড়ের মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের কথা আপনরা অনেকেই ইতিহাসে পাঠ বরিয়াছেন। যদি এখন ঠিক সেই কালপাহাড়ের ন্যায় কোয় প্রবল শক্তি আসিয়া আমাদিগকে ঐ সকল শাস্ত্রোল্লিখিত শূকর, মোরগ, গরু ও মহিষাদির মাংস খাইতে বলে, তবে তখন

নিরাপত্তিতেই আমরাও তাহা করিব, তথাপি নিজ বিচারের বলে স্বইচ্ছায় শাস্ত্রসঙ্গত ও গুণবিশিষ্ট মাংসাসি খাদ্য খাইয়া নিজেদের স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মোন্নতির কোন চেষ্টা করিব না। ইহাই আমাদের ভারতবাসী হিন্দুগণের অবিচারিতা ও অজ্ঞানতার বিশেষ পরিচয়। তাই বর্ত্তমান যুগে প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুগণের বিবাহাদি শাস্ত্রসঙ্গত ব্যাপারেও গবর্ণমেণ্টের আইনানুযায়ী শাসন ব্যতীত, আমরা অবিচারী হিন্দুগণ নিজেদের কিছুই সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া লইতে কোন চেষ্টাই করি না।

ধর্ম্ম

বর্ত্তমানে আমরা যে হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া মুখে চীৎকার করি, প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের মূল। কিন্তু এখন তাহার মূল বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত হিন্দুধর্ম্মই একমাত্র ছুঁৎমার্গাবলম্বন করিয়া পাকের ঘরের চুলার নিকট যাইয়া চচ্চরি তৈয়ার করিতেছে। কেবল কে কি আহার করিল এবং কাহার স্পৃশ্য বস্তু আহার করিল, মাত্র ইহার উপরই এই হিন্দুধর্ম্ম সামান্য একটু সংস্কারের সূক্ষ্ম সূতার সঙ্গে ঝুলিতেছে। যে কোন দেশের বা সমাজের একতার বন্ধন ছিন্ন হইলেই তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। আধুনিক সংস্কারান্ধ বিচারহীন সমাজ-পতিগণের স্বার্থহানির ভয়ে ভীত হইয়া, অথবা অজ্ঞতা প্রযুক্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে ধর্ম্ম ও একতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া, আমরা হিন্দুগণ এখন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া অনেক বিষয়েই শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছি। অতি সংক্ষেপে সেই পুরাকালের ২।৪টী সামাজিক বিষয়ের

দৃষ্টান্ত দিলেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় সহজে বোধগম্য হইবে।

সেই পুরাকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের একত্রে ভোজন ও বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাই তাঁহাদের একতার বন্ধন দৃঢ় ও ধর্ম্মোন্নতি ছিল। কিন্তু এখন শুধু রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক অথবা কুলীন বংশজাদি ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণেও বিবাহ চলিতে পারে না। আহারাদি বিষয়েও একে অন্যকে স্পর্শ করিলেই জাতি, ধর্ম্ম সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। সেকালে ব্রহ্মচর্য্য ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানবলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিত, কারণ উকিল মুন্সেফ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদগুলি যেরূপ মানুষের নিজ নিজ বিদ্যা-বুদ্ধির শক্তিবলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ও ঈশ্বরসৃষ্ট অথবা মানুষের জন্মগত বা বংশগত নয়, ইহা মানুষের নিজ অর্জিত। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মনের গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা সেই সেই বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই ভগবান মনু বলিয়াছেন—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥
তপোবীর্য্যপ্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেম্বিহ জন্মতঃ॥ (মনুস্মৃতি)

অর্থাৎ—"তপস্যা এবং বীর্য্য দ্বারাই ইহলোকেই যুগে যুগে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্বরূপ একে অন্যের উৎকর্ষাপকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন।" শাস্ত্র বলিতেছেন—

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥ (মনুসংহিতা)
ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্ম-বিশেষাৎ॥ (সাংখ্য দর্শন)

অর্থাৎ—"মাতৃ গর্ভ হইতে লোকে ভূমিষ্ঠ হইলেই সে 'শূদ্র' পদবাচ্য হয়, কিছুদিন পরে তাহার সংস্কার হইলে তখন তাহাকে 'দ্বিজ' বলা হইয়া থাকে,

৭

তৎপরে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে তিনি 'বিপ্র' বলিয়া কথিত হয়েন এবং সর্ব্বশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে তিনি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এইভাবেই কর্ম্ম বিশেষের পার্থক্য দ্বারা শূদ্রাদি ব্যক্তিদিগকে বা বর্ণ চতুষ্টয়কে ভেদ করা (পৃথক করা) হইয়াছে। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ। (গীতা ৪র্থ অঃ)

অর্থাৎ—"সত্ত্ব. রজঃ, তমঃ ও শম-দমাদি গুণ এবং কর্ম্মবিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ চতুষ্টয়কে আমি সৃষ্টি করিয়াছি।"

বর্ত্তমান যুগেও পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে কোন কোন শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু এখন 'কলিযুগ' অর্থাৎ অজ্ঞানতার বা বর্ব্বরতার যুগ কিনা, তাই সমাজপতিগণও দোষ-গুণের কোনই বিচার না করিয়া, দেবত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত শূদ্রকে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে কুণ্ঠিত হইয়া, চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণতনয়কেও 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উচ্চাসন দিয়া নিজেদের অজ্ঞতা ও অবিচারিতার বিশেষ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। অর্থাৎ এখন অজ্ঞান, পশুতুল্য হইলেও একমাত্র ব্রাহ্মণের পুত্রই 'ব্রাহ্মণ' পদবাচ্য হইয়া থাকে, অন্য কেহ দেবতুল্য হইলেও তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা চলে না। সেই পুরাকালে স্ত্রীলোকের পতি বিয়োগে দেবরও পতি হইত এবং পিতার অজ্ঞাত ভাবেও সন্তান জন্মিলে সেই সন্তান ও তাহার মা সমাজে পরিত্যক্ত হইত না। আর এখন তাহার বিপরীত। যুবতী বিধবার বিবাহ দিলেও তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় এবং সে সমাজে অচল হয়। গান্ধর্ব্ব, স্বয়ম্বরাদি বিবাহ প্রথা এখন কোথায়? শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে ও গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে মধুপর্কের জন্য এখন সেই বেদবিহিত গরু-ছাগাদি পশু বধ করা হয় কি? যে খাদ্য খাওয়াতে মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বিগণ বর্ত্তমান হিন্দুদের নিকট অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইতেছে, সেই পুরাকালে ঐ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সকল খাদ্যাখাদ্যের কোনও প্রভেদ ছিল না। তাই তখন হিন্দুগণও বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন। আর

এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ধারণ করায়, হিন্দুদের মধ্যে শাক্ত আমিষভোজী, বৈষ্ণব আমিষ ও নিরামিষ উভভোজী হইয়াছে। অর্থাৎ বৈষ্ণবদের মধ্যে কেহ মাংসত্যাগী মৎস্যভোজী, আর কেহবা (বৃকটগণ) মাংস ত দূরের কথা মৎস্যভোজীকে স্পর্শও করিবে না, তাহারা কেবল শাক-সব্জী খায়। মৎস্যাহারী বৈষ্ণবদের মধ্যেও আবার বিভিন্ন শাখা রহিয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশেই 'কিশোরীভজন' এবং 'গোপিনিগণের বস্ত্রহরণ' ইত্যাদি নানাপ্রকার কৃষ্ণলীলা রসাস্বাদনে রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য মাতোয়ারা। আবার, কেহবা ফোঁটা-তিলকধারী, মালা-জপকারী। অন্য একদল ভেকধারী বৈষ্ণব, ইহারা মৎস্যাহার করে বটে, কিন্তু প্রকাশ্যে বিবাহ করে না, অথচ প্রত্যেকের সঙ্গেই একটী বা ততোধিক বিধবা স্ত্রীলোক (সেবাদাসী বা বৈষ্ণবী) রাখিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া উহাদের গর্ভ সঞ্চারের শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। অনেক স্থলে ঐ ঔষধের শক্তি ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় গুপ্তভাবে অসংখ্য ভ্রূণ হত্যাও করিয়া থাকে। অথচ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমাজপতি গোস্বামিগণ ঐ সকল বীভৎস কার্য্য দেখিয়া শুনিয়াও তাহার কোনই প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া, স্বার্থহানি ভয়ে ঐ সকল রসাস্বাদনেই মজিয়া থাকেন। ইহারই কি নাম 'ধর্ম্ম'? এইরূপ বহু শাখা-প্রশাখাই রহিয়াছে। যে সকল অসংখ্য ব্রতনিয়মাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া এখন হিন্দু সমাজে পুরোহিত ঠাকুরদের ব্যবসা চলিতেছে, পূর্ব্বে সে-সকল কোথায় ছিল? রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিকাদি ব্রাহ্মণদের শ্রেণী বিভাগ মধ্যেও আবার কুলীন, বংশজ, কাপ্ ইত্যাদি নানাপ্রকারের ভেদাভেদ সেকালে ছিল কি? বিবাহাদিতে পুত্রপণ, কন্যাপণ প্রভৃতি পণপ্রথা, যেই পণপ্রথার তাড়নায় অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে তাহা সেকালে কোথায় ছিল।

ঐ সমস্ত বহু শাখা-প্রশাখার সামাজিক রীতিনীতি ও খাদ্যাখাদ্য সকল বিষয়েই একত্র হইয়া যেদিন হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সেইদিন হইতেই হিন্দুগণ প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া ধার্ম্মিক হইতে

পারিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম কাহাকে কহে এবং তাহা কিরূপাবস্থায়, কোথায় থাকে এবং কি প্রকারে সেই ধর্ম্ম অর্জ্জন করা যায়, আবার কিরূপেই বা তাহা নষ্ট হইয়া যায় ইত্যাদি বিষয়গুলির সত্যতত্ত্ব বেদবাণীর দ্বারা অবগত হইতে পারিলেই তখন এই নব্য হিন্দুদের পূর্ব্ববর্ণিত মনের সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারসকল দূরীভূত হইয়া গিয়া একতার বন্ধনে ধর্ম্মোন্নতি হইবে এবং তাহারা শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধিকরতঃ দেশে ও সমাজে শান্তি স্থাপনক্রমে কালাতিপাত করিতে পারিবে। পূর্ব্ববর্ণিত সামাজিক রীতিনীতি এই মায়ার সৃষ্টিতে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে ও হইবে, কিন্তু আত্মধর্ম্ম পরিবর্ত্তন হইলেই তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

ধর্ম্ম অর্থে স্বভাব বা শক্তিকে বুঝায়। যাহার যে স্বভাব বা শক্তি আছে, তাহাই তাহার প্রকৃত ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে সহ সদাকালই বিদ্যমান থাকে। এই জগতে দৃশ্যমান সকল বস্তুরই এক একটী ধর্ম্ম আছে, কেহই ধর্ম্ম বিরহিত নয়। কারণ ধর্ম্মহীন কোন বস্তুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতে পারে না। যেমন জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ জলের স্বভাব বা শক্তি 'তরলতা'। এই 'তরলতা' জলের সঙ্গেই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু জল হইতে তাহার ঐ 'তারল্য' স্বভাব বা ধর্ম্ম বাদ দিলে কিছুতেই জলের অস্তিত্ব প্রামাণিত হয় না। দাহিকা শক্তি ও দীপ্তি এই দুইটি আগুনের ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত জলের ন্যায় এই অগ্নিরও ঐ ধর্ম্ম বা স্বভাব দুইটী অগ্নি হইতে পৃথক করিয়া দিলে তখন সেই আগুনের আর কোনই অস্তিত্ব থাকে না, তাই সর্ব্বদাই উহা সেই আগুনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে। ঠিক ঐরূপ এই জগতে যত প্রকারের মানুষ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই ধর্ম্ম আছে। মানুষ জাতির ধর্ম্ম মনুষ্যত্ব অর্থাৎ জ্ঞান। মানুষকে শোক, দুঃখ বা অর্থাভাব ও স্বজন-বিয়োগাদি সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে তাহাদের স্বধর্ম্ম একমাত্র জ্ঞানই সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। অগ্নি যেমন স্বধর্ম্ম দাহিকা

শক্তির বলেই ক্ষিত্যাদি অপর ভূতাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, এই মায়ার সৃষ্টিতে মানুষও তাহার স্বধর্ম্ম একমাত্র মনুষ্যত্ব বা জ্ঞানবলেই সমস্ত জীবজন্তুর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। আহার নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, এই সকল বিষয়ে মানুষ ও পশু-পাখী সকলেই সমান। একমাত্র জ্ঞানেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। জ্ঞানহীন লোক পশু, তুল্য. ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের বাণী। এই জ্ঞানবলেই মানুষ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জগতের সমস্ত কিছু জানিয়া লইতে পারিতেছে এবং এইজন্য জ্ঞানই মানুষের সমস্ত জীবনের একমাত্র সম্বল। সেই জ্ঞান যাহার নাই সে নরাকৃতি হইলেও পশুতুল্য। এতৎসম্বন্ধে বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই বহু যুক্তি প্রমাণও রহিয়াছে।

গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

অর্থাৎ—"অগ্নি যেরূপ পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করে অথবা অন্ধকার দূর করিয়া সেই স্থানকে আলোকিত করে, মানুষের জ্ঞানরূপ অগ্নিও তদ্রূপ সমস্ত অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারকে ভস্মসাৎ (ধ্বংস) করিয়া দিয়া, ইহজগতের ও পরজগতের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাইয়া দেয়।"

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে। (গীতা)

অর্থাৎ—"জ্ঞানের মত চিত্তশুদ্ধিকর ও আনন্দদায়ক ত্রিভুবনে কোন বস্তু নাই।" অতএব দাহিকাশক্তি হীন হইয়া কেবল অগ্নির ন্যায় লাল রং বিশিষ্ট যে কোন পদার্থ হইলেই যেমন তাহাকে আগুন বলা চলে না, ঠিক সেইরূপ মনুষ্যত্ব বা জ্ঞানাগ্নিহীন কেবল মানুষের আকৃতি হইলেই তাহাকেও মানুষ বলা যায় না।

বস্তুর স্বরূপ জানার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। সদসৎ বিচার দ্বারা সত্য নিরূপিত হইলেই লোকের

জ্ঞানার্জ্জন হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কারাবদ্ধ, সঙ্কীর্ণচেতা, বিচারহীন ব্যক্তি কখনও সেই জ্ঞান লাভে সক্ষম হয় না। তাই শ্রুতিও বলিয়াছেন,—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

অর্থাৎ—"মনের বিচারশক্তি ও তেজবীর্য্যহীন দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তি ধর্ম্ম বা আত্মাকে কখনও লাভ করিতে পারে না। ঐ জ্ঞানকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই দৃশ্যমান ব্যবহারিক জগতের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান এবং স্থূল নেত্রের দৃষ্টির অগোচর পারমার্থিক জগতের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান। ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান লাভ করিয়াই পরে পারমার্থিক জগতের পরমতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। বেদ-বেদান্তজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপায়, প্রথমে দেহতত্ত্ব, পরে মনস্তত্ত্ব এবং তৎপরে পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া তত্ত্বাতীত হওয়া যায়। তাই যিনি ব্যবহারিক জগতের তত্ত্বাবগত হইতে পারিয়াছেন তিনি শ্রেষ্ঠ এবং যিনি মনস্তত্ত্বাবগত হইয়াছেন তিনি শ্রেষ্ঠতর, তৎপর যিনি পরম তত্ত্বাবগত হইয়াছেন তিনি শ্রেষ্ঠতম বলিয়া গণ্য হন। জ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার সাধনার চরম ফল। অতএব একমাত্র জ্ঞানই মানুষের ধর্ম্ম। এই জ্ঞান লাভ করিয়া ধাম্মিক বা তত্ত্বাতীত হইয়া অব্যক্তে লীন হওয়া ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং ইহাই প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম বা মানুষের ধর্ম্ম। তাই মহাত্মা সমস্‌তব্রেজ বলিয়া গিয়াছেন—

গুম্ শুদন্ দর্ গুম্ শুদা দীনয়ে মন্ অস্ত্।

অর্থাৎ—"অব্যক্তে লীন হওয়াই আমার ধর্ম্ম।"

উপসংহার।

ঈশ্বরের এই সৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রকার প্রাণীর মধ্যেই মানবজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা মানবের অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়াই তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। পশু-পক্ষীদিগকে

প্রকৃতির বাঁধা নিয়মেরই বশীভূত হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু মানব বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের বলে সর্ব্বদাই প্রকৃতিকে বশে রাখিয়া নিজ প্রয়োজনানুযায়া কার্য্যোদ্ধার করিয়া অনেক বিষয়ে স্বাধীনভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ দেখ—প্রকৃতি গ্রীষ্ম দিয়াছে, মানুষ বুদ্ধিবলে তাহার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা হাওয়ার ব্যবস্থা করিল; শীত দিয়াছে, তখন পশমী জামা ও লেপ ইত্যাদি দ্বারা গরম থাকিবার ব্যবস্থা করিল, দৈনিক আহারের পরেও ঘরে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে; এমন কি মনের অভিরুচি হওয়া মাত্রই কালাকাল বিচার না করিয়া স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বাস করিতে পারে, ইত্যাদি বহু বিষয়েই মানুষের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু পশু-পক্ষীদের শীত গ্রীষ্মে কোন নূতন ব্যবস্থা করা বা আহারের পরে অতিরিক্ত খাদ্য পাইলেও তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখা অথবা নির্দ্দিষ্টকাল ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষে সহবাস করা ইত্যাদি ঐ সকল কোন কিছুতেই তাহাদের স্বাধীনতা নাই। আহার্য্য বস্তু বিষয়েও ঠিক সেইরূপ গরু, মহিষ, ছাগলাদি তৃণভোজী পশুদিগকে জোরপূর্ব্বকও যদি কেহ মাংস খাওয়াইয়া দেয় এবং সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসভোজী পশুদিগকে যদি কতকগুলি করিয়া ঘাস খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবে উহারা কিছুতেই বাঁচিবে না। যেহেতু ঈশ্বর উহাদের পাকস্থলীও ঠিক এইরূপ ভাবেই তৈয়ারী করিয়াছেন যে, ঠিক ঠিক মত উহাদের নিজ নিজ খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন বিরুদ্ধ খাদ্যই পাকস্থলীতে হজম হইবে না, তাই তাহারাও তাহা খাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ঐ আহার্য্য বিষয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু নয়ন গোচর হইতেছে, মানব বুদ্ধিবলে নানাপ্রকার পাকপ্রণালীর কল-কৌশলাবলম্বনে সমস্ত বস্তুকেই খাদ্যে পরিণত করিয়া আহার করিতেছে এবং তাহা তাহাদের পাকস্থলীতে হজমও হইতেছে। যেই বস্তু যাহার অখাদ্য সেই বস্তু তাহার পাকস্থলীতে কখনও হজম হইবে না, ইহাই খাদ্য ও অখাদ্যের প্রকৃত প্রমাণ। পেটের অজীর্ণ বা অন্য

কোন ব্যাধিতে আক্রমণ করিলে মাত্র তখন ঐ রুগ্নাবস্থার জন্যই মানুষের খাদ্যাখাদ্য বিচারের প্রয়োজন হইবে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদা সকল সময়ে স্বাভাবিক (অর্থাৎ যাহা পাকস্থলীতে হজম হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ) খাদ্যই খাইবে, তাহাতে কোন শাস্ত্র বা যুক্তি-প্রমাণের দরকার হয় না।

লৌহ, তাম্র, পিত্তল, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং অভ্র প্রভৃতি খনিজ পদার্থসকল কাহারও উদরস্থ হইলে তাহা বিষক্রিয়া উৎপন্ন করে। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবলে ঐ সকল বিষাক্ত অখাদ্য পদার্থকেও পাকপ্রণালী দ্বারা অতি উত্তম খাদ্য (ঔষধরূপে) পরিণত করিয়া লইয়া ব্যবহার করিতেছে। অতএব আবহমানকাল হইতেই খাদ্য বিষয়েও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই তাহাদের পাকস্থলীতে হজম হইয়া আসিতেছে এবং ইহার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরও উভয় প্রকার খাদ্য খাইতেই মানুষকে সম্মতি দিতেছেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেই বলে যে 'হিন্দু ও মুসলমানের খাদ্যাখাদ্য কখনও কিছুতেই এক প্রকার হইতে পারে না, বহু প্রভেদ থাকিবে'। ঈশ্বর নিরপেক্ষ, তাই তাঁহার সৃষ্ট দ্রব্যগুলিও নিরপেক্ষ-ভাবেই সর্ব্বসম্প্রদায়ের উপর সমান ক্রিয়া করিয়া থাকে। মনে কর, হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টানাদি যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী মানুষই হউক না কেন, তাহাদের যে কেহ আফিঙ্গ মুখে দিলে তিক্ত স্বাদ ও চিনি মুখে দিলে মিষ্টতার বোধ হইবে এবং জল পান করিলেও পিপাসা দমন হইবে। অথবা কেহ ঐ আফিঙ্গ অতিরিক্ত পরিমাণে খাইলে সেই বিষে তাহার জীবন নষ্ট হইবে—কোন সম্প্রদায়ই রেহাই পাইবে না। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে কাহারও কোন মতভেদ নাই। কিন্তু হিন্দু, মুসলমানাদি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ মানুষের মনঃকল্পিত, উহা কখনও ঈশ্বর পৃথক করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। কারণ নিরপেক্ষভাবে বিচার

করিলে দেখা যায় যে, ঈশ্বর যে ভাবে যাহা পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষের সহস্র চেষ্টায়ও কিছুতেই তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, আর মানুষের সৃষ্ট কার্য্য মানুষেই ইচ্ছানুযায়ী সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছে,—তজ্জন্য ঈশ্বরের অপেক্ষা করে না। যেমন সৃষ্টি রক্ষার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ এই দুইটী শ্রেণী ঈশ্বর পৃথক করিয়া দিয়াছেন। এখন যদি কোনও পুরুষ স্ত্রীলোকের উত্তম বেশ-ভূষা এবং গহনাদি পরিধান করিয়াও স্ত্রীলোক হইতে ইচ্ছা করে, তথাপি সে কিছুতেই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইতে, কিংবা কোন স্ত্রীলোক ঐরূপ পুরুষ সাজিলে সেও কিছুতেই পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। অথবা ঈশ্বর সৃষ্ট একটী মানুষ কখনও গরু হইতে বা গরু কখনও মানুষ হইতে পারে না। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট হিন্দু মুসলমানাদি সম্প্রদায় মধ্যে অহরহই হিন্দুগণ মুসলমানত্ব বা খৃষ্টানত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। পক্ষান্তরে বহু মুসলমান এবং খৃষ্টানও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল জানিয়া বুঝিয়াই সমদর্শী বিচারশীল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মানুষকে সমস্ত দ্রব্যের গুণাগুণ দেখাইয়া দিয়াছেন মাত্র; কিন্তু হিন্দু, মুসলমানাদি সম্প্রদায় ভেদে কোন খাদ্য-দ্রব্যের গুণাগুণের পার্থক্য হইবে বলিয়া কোন কিছুই নির্দ্ধারণ করেন নাই। পূর্ব্বপূর্ব্ব জ্ঞানী সমাজস্থাপকগণও পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়ভেদে কোন খাদ্যেরই বিভেদ করেন নাই। মহম্মদীধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাহাদের বর্ত্তমান অখাদ্য শূকর ও কচ্ছপ খাইত এবং পূর্ব্ব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণও মুরগী এবং গোমাংসাহার করিতেন,—তাহাতে কাহারও কোন বাধা ছিল না। কালক্রমে সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক যে সংস্কারের বশে শূকর ও কচ্ছপ মুসলমানদের নিষিদ্ধাহার বলিয়া গণ্য হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ সংস্কারের বশেই হিন্দুদেরও মুরগী ইত্যাদি নিষিদ্ধাহারে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এতৎসম্বন্ধে এমন কোন যুক্তিও নাই যে ঐ সকল খাদ্য তাহাদের উদরস্থ হইলেই নানাপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি

হইবে বা জাতিধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইবে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি জাতিভেদে আহারের প্রভেদ আবাহমানকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে এবং ইহা ব্যক্তিমাত্রেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং কেবল ধর্ম্মাভিমানী অজ্ঞগণই লোকের মধ্যে ঐ সকল সম্প্রদায় ভেদে খাদ্যের বিভেদরূপ কুসংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে। আজ তাহারই ফলে এই ভারতে হিন্দু সমাজের একতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হইয়া পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি করিয়া এই ভারতকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মে সর্ব্বদাই মানুষের আহার দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে পরিমাণে কিছু হ্রাস, বৃদ্ধি বা সাময়িক কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে ও হইবে।

হিন্দু সমাজের কুসংস্কার দূর করিবার জন্যই এই সকল শাস্ত্র এবং অতীত ও বর্ত্তমান মানব জগতের আমিষ ও নিরামিষাহারের বিষয় আলোচনা ক্রমে এই গ্রন্থ লিখিত হইল। সর্ব্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে একমাত্র নিরামিষ আহারই সাত্ত্বিকাহার বলিয়া একটা ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু নিরামিষ আহার সর্ব্বত্র, সকল সময়ে, সকলের পক্ষে সাত্ত্বিকাহার বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব ঐ কুসংস্কার সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিয়া, প্রয়োজনবোধে দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে যে কোনও ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মৎস্য-মাংসাদি দ্বারাই আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকারের আহার করিতে পারে এবং তাহাতে কাহারও কোন জাতি বা ধর্ম্ম নষ্ট হইবার কিছুই আশঙ্কা নাই, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচার করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ ধর্ম্ম মনের অনুরাগের বিষয়; উহা বাহ্যিক কোন অনুষ্ঠানের বিষয় নয়। কেবল বাহ্যিক ফুল বিল্বপত্র দ্বারা দেব-দেবীর অর্চ্চনা করিলে বা ফোঁটা, তিলক ও নিরামিষাহার অথবা গঞ্জিকা-সেবন, বিভূতি-মর্দ্দন ও লম্বা চিমটা ধারণাদি বিভূষণ দ্বারা অনুষ্ঠানের আড়ম্বর থাকিলেই পরম ধার্ম্মিক অথবা বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ বা সাধু হওয়া যায় না। গোমাংসাহার করিয়াও

ঐ সকল বিনা আড়ম্বরে শুধু আত্মকার্য্য দ্বারাই পরম বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ ও সাধু হইতে পারে। পুরাকালে যেমন মানুষের মনের গুণানুযায়ী ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব ও শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকিত, আহারও ঠিক সেইরূপ। সর্ব্বপ্রকার খাদ্যই মানবের রুচি ও দেহের উপযুক্ততা অনুসারে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণী হইয়া থাকে। যাহার মন এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব আহরণ অর্থাৎ আহার করে (শ্রবণ করে) সেই বিচারশীল ব্যক্তিই মাত্র একাহারী ও সাত্ত্বিক আহারী বলিয়া গণ্য, ইহা ছাড়া অন্য সকলেই বিষয় তত্ত্ব শ্রবণ দ্বারা বহু রাজসিক ও তামসিক আহার করে ; তাই তাহাদের দুর্গতির একশেষ হয়।

একমাত্র সত্যের উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে—মিথ্যাতে কখনও নয়। সুতরাং সংস্কারান্ধ তথাকথিত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের মিথ্যা কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদান্তের এবং আহার বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের আদেশানুযায়ী আমাদিগকে চলিতে হইবে, ইহাই সকলের মনে রাখিয়া সর্ব্বত্র আলোচনাক্রমে সকলকে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং দেশে যাহাতে সত্যের প্রচার দ্বারা একতার সৃষ্টি হইয়া শারীরিক ও মানসিক বলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সর্ব্বপ্রকারেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া শান্তির ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং ইহাই ব্যবহারিক জগতের প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম।

কেবা আমি কিংবা মম এ'জ্ঞান না হ'লে
অজ্ঞান পশুর সম সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
নরদেহ লভি' কর শ্রেষ্ঠ অভিমান,
কামিনী কাঞ্চনে ম'জে পশুর সমান॥

গ্রন্থসার।
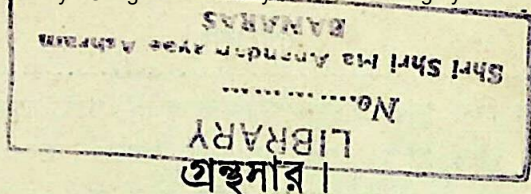
গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী অনুসারে দেখা যায়, যে সকল গুণ বিশিষ্ট আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দ্রব্যগুণ দৃষ্টে ছাগ, মেষ, মহিষ, ঘোড়া, গাধা এবং শূকর, দুম্বা ও কচ্ছপ, মোরগ প্রভৃতি পশু-পক্ষীর মাংসেই সেই সকল গুণ অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। এই কারণেই সেই পুরাকালের মুনিঋষিগণও ঐ সকল অসংখ্য পশু-পক্ষীর মাংস আহার করিতেন। সুতরাং গীতা এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্তি মতেও মাংসই খাদ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেছে। তদ্ভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি, সংহিতা এবং তন্ত্র-পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই যে-কোনও সময়ে একমাত্র মাংসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, অথবা যে-কোনও কার্য্যোপলক্ষে মাংসাহারেরই ব্যবস্থা করিতে শাস্ত্রকারগণ বিধি দিয়াছেন। সুতরাং কুসংস্কারান্ধ, অবিবেকী ও অজ্ঞদের মিথ্যাকথার ধাঁধায় পড়িয়া, ঐরূপ সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত শ্রেষ্ঠ খাদ্য মাংসাহার ত্যাগ করা মানুষমাত্রেরই অত্যন্ত বিগর্হিত ও মহা পাপকার্য্য বলিয়া জানিবে। যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, মানুষমাত্রেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকারের খাদ্যই গ্রন্থোক্ত মতে মনের সূক্ষ্ম আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সেই নির্ব্বিষয়ী নিরামিষ আহার দ্বারা আহারশুদ্ধি করিতে পারিলেই তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে। ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের বাণী ও প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম।

সমাপ্ত

পরমহংস শ্রীমৎ কালিকানন্দ স্বামী প্রণীত

সত্য দর্শন

[দ্বিতীয় (পরিবর্দ্ধিত) সংস্করণ]

এই পুস্তকে বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র-পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র-সাগর মন্থন করিয়া ধর্ম্মই যে একমাত্র সত্যবস্তু এবং সেই ধর্ম্ম কখনও বহু নয়, একই বস্তু, সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া স্বামীজী এই গ্রন্থে তাহাই প্রাঞ্জল-বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও এই গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার ধর্ম্ম বিষয়ে হিংসা-দ্বেষ বিদূরিত হইয়া নূতন একটী জ্ঞানালোকে শান্তি পাইবেন এবং গন্তব্যস্থানে পোঁছিতে পারিবেন। দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার, মাসিক প্রবাসী, মাসিক ইংরাজী প্রবুদ্ধ ভারত প্রভৃতি বহু সংবাদপত্রও এই "সত্য দর্শন" গ্রন্থের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন এবং পুস্তক ক্রেতাগণের বহু শত শত প্রশংসাপত্রও পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেকেরই এই পুস্তক পাঠ করিয়া লাভবান হওয়া উচিত। ডিমাই সাইজের ৫০৮ পৃষ্ঠার পুস্তক—মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

ঋষি গীতা

এই পুস্তকে সরল বাংলা অনুবাদ সম্বলিত সারতত্ত্বোপদেশ, মোহমুদ্গর, নির্ব্বাণ ষট্‌ক, গুরুর-স্তব, কাশী-পঞ্চক প্রভৃতি স্তোত্রাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রকৃত পরম তত্ত্ব কি? যে ভ্রান্তিবশে মানুষ তাহার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ক্ষুদ্র জীবত্বে পরিণত হইয়াছে, কি ভাবে চলিলে এই মোহ বিদূরিত করিয়া এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মানুষ অবিচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিতে পারে, তাহার নির্দ্দেশমূলক স্বামীজির একশত উপদেশ এই পুস্তকে স্থানলাভ কয়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বামীজি রচিত আত্মতত্ত্বমূলক প্রায় পঞ্চাশটী গান এই পুস্তকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

ঐ সকল পুস্তক প্রাপ্তিস্থান:—

গ্রন্থকারের নিকট—বি ১৭।৫৫, তিলভাণ্ডেশ্বর রোড, বারাণসী, ইউ. পি

মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ-১২

কালিকানন্দ বেদান্ত আশ্রম (শাখা)—১২১, নিউ টালিগঞ্জ,
পোঃ পূর্ব্ব পুটিয়ারী, ভায়া—কলিকাতা-৩৩